কিছু কথা কিছু গান

হুমায়ূন আহমেদ

লেখকের অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা

প্রতিদান চাইনি

অপেক্ষা

শেষবিকেলের পথরেখা

সত্যের গল্প গল্পের সত্য

সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

কিছু কথা কিছু গান

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বি.কম. (অনার্স) ও এম.কম.। বি.আই.এম. থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আই.সি.এম.এ.বি. থেকে সি.এম.এ. এবং বর্তমানে একজন এফ.সি.এম.এ.। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচ.ডি.। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো।

তেত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

কিছু কথা কিছু গান

হাসনান আহমেদ

নবকৃতি

কিছু কথা কিছু গান

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০২১

প্রকাশক
প্রকৃতি
১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.books@gmail.com

প্রচ্ছদ
মনন মোর্শেদ

মুদ্রণ
অর্ক
৩/১, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-১৪৩৯-৭

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Kichu Katha Kichu Gan by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, November 2016
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

সোদরপ্রতিম প্রয়াত-সহকর্মী
জ্ঞানজ্যেষ্ঠ
অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার কথা

‘নেই কাজ তো খই ভাজ’– কথাটা সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। এই খই-ভাজা কারো পেশা, আবার কারো কারো নেশা। যাঁদের এটা নেশা, তাঁরা মূল কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই খই ভেজে থাকেন। আমি সময় পেলে মাস্টারি কাজের অবসরে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও জীবনের নিরঙ্কুশ বাস্তবতা নিয়ে দলমত নির্বিশেষে খই ভাজি। বর্তমান সমাজে খইয়ের ব্যবহার কমার সাথে সাথে নির্ভেজাল খই-ভাজার প্রচলনও অনেকটা কমে গেছে। তাছাড়া ভেজাল খই ভাজতে ভেজাল উপাদানে বাজার সয়লাব। তপ্ত খোলায় এবং উত্তপ্ত বালিতে খই ভাজা আবার ঝুঁকিরও ব্যাপার। তবু নেশা কি আর ঝুঁকি মানে? আর খই ভাজা যাঁদের নেশা, তাঁরা কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন? স্বাধীনচেতা পেশার নেশায় খই তাঁরা ভাজবেনই। তাই এই খই ভাজা।

ছোট-ছোট গল্প আকারে আমার ভাজা-খইয়ের একটা সংকলন প্রকাশের অবুঝ ইচ্ছে আগে থেকেই আমার ছিল। সেটা এবার বাস্তবে রূপ নিল। লেখাগুলো চলমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রূঢ় বাস্তবতার আলোকে রচিত– যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার নসিহত করা সম্ভব, ধামাচাপা দেয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরা সম্ভব, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ। অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

লেখাগুলোকে কোনো দলমতের পক্ষে-বিপক্ষে না-ভেবে বাস্তবতার অকপট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করলে এবং পাঠকসমাজে চিন্তা ও চেতনার খোরাক জোগালেই আমার সার্থকতা।

ঢাকা, নভেম্বর ২০১৬

(হাসনান আহমেদ)

‘কিছু কথা কিছু গান’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান: ডিসেম্বর ১৫, ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

’কিছু কথা কিছু গান’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ রচিত ‘কিছু কথা কিছু গান’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. রিজওয়ান খান-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মো: মোশাররফ হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. চৌধুরী মোফিজুর রহমান। লেখক অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ বলেন, ‘আমি বিদ্যমান সামাজিক-পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দলমত নির্বিশেষে অসীম জীবনের চেতনা ও নিখাদ বাস্তবতা কালির আখরে রেখাঙ্কিত করেছি মাত্র। বিদ্যমান সমাজের অব্যবস্থা, নীতিহীনতা, বাগাড়ম্বরতা, আইন ও নিয়মহীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের ধস-নামা অবক্ষয়কে আমি লেখার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। লেখাগুলোকে চলমান সময়ের জীবন ও সমাজআলেখ্য হিসেবে গণ্য করলেই আমার লেখার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হবে।’ প্রধান অতিথি ’কিছু কথা কিছু গান’ বইয়ে উল্লিখিত সামাজিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিহীনতার উদাহরণ টেনে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন জাতির মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কিছু কথা
কিছু গান

সূচিপত্র

তেলেসমাত দীক্ষাকেন্দ্র ১১
আশরাফ আলী কথনিকা ২৩
ভালো আছি ভালো থেকো ৪১
মহাতাব সমাচার ৫১
‘সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?’ ৬১
নিত্যানন্দ মেলা ৭১
গন্তব্যহীন যাত্রা ৭৯
অন্তহীন নৈরাজ্যে বসবাস ৮৫
ক্রোড়পত্রের পাদটীকা ১২৫

তেলেসমাত দীক্ষাকেন্দ্র

‘অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ ভোলে না– কেউ ভোলে।’ সত্যি বলতে কি, বাল্যস্মৃতি ভোলা বেশ কঠিন। সালেক ভাইকে ভোলা আরো কঠিন। তিনি এখন ব্রেইন-স্ট্রোকে শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। আমি গুনছি তার সাথে কাটানো স্মৃতিময় দিনগুলো।

আমি তখন কিশোর। বয়স তেরো-চৌদ্দ। তাঁর আঠারো-উনিশ। আমার কিশোর বয়সের গুরু। আমার ও সহপাঠীদের বিশ্বাস, তিনি ঐ বয়সে সব বুঝতেন এবং জানতেন। আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনের সব জিজ্ঞাসার জবাব তিনি দিতেন। তিনিও সমবয়সীদের সাথে নিয়ে চলতেন। মাঝে মাঝে আমাদেরকে শাসন করতেন– কখনো ধমক দিয়ে, কখনো-বা আদরের সুরে। দুর্বলতা তাঁরও ছিল। তিনি ছিলেন স্কুল-পালানো ছাত্র। অধিকাংশ দিনই স্কুল পর্যন্ত পৌঁছাতেন না। স্কুলের পথেই সতীর্থদের নিয়ে কোনো বাগানে বসে আড্ডা দিতেন, খেলাধুলা করতেন, কিংবা গাছ থেকে আম-জাম বা অন্য ফল পেড়ে খেতেন। স্কুল থেকে ফেরার সময় হলে বাড়িতে হাজির হতেন। বিকেলে খেলার মাঠে আগে আগে থাকতেন।

সন্ধ্যা লাগলেই কোথায় কোনদিন ‘জারিগান’, ‘পীরের গান’, ‘মধুমালা নাটক’, ‘যাত্রা প্যান্ডেল’– সব তার মুখস্ত, সব জায়গায় তার উপস্থিতি অনিবার্য। কার গাছে ভালো ডাব ধরেছে, কার ক্ষেতে মিষ্টি কাঁকুড় বড় হয়েছে সে খোঁজও তাঁর নখদর্পণে। আমাদের তথ্যভাণ্ডার। ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করার পর থেকেই তাঁর লেখাপড়ায় বিরতি চলছে। মনে হয় জীবনের একটা পাঠ এভাবেই পাকাপাকি চুকে গেছে। ও-নিয়ে তাঁর এত ভাবনা-চিন্তা করার সময় কোথায়!

আমরা তাঁদের জুনিয়র ব্যাচ– তাঁদের থেকে কোনো অংশে কম নই। ওঁরা আমাদের শিক্ষাগুরু। আমি আমাদের ব্যাচ-নেতা। আমার মতো বাউণ্ডুলে ছেলে সে-সমাজে তখন ক জনই-বা ছিল! সমস্ত কাজ-অকাজের আগে আগে থাকাটা আমার স্বভাব। প্রয়োজনে সালেক ভাইয়ের সমর্থন নেয়ার জন্য প্রস্তুত। সালেক ভাই আমাদের ছায়া দিয়েছেন, গাইড করেছেন, প্রয়োজনীয় সুযুক্তিও(?) দিয়েছেন। আমাদের অগ্রজ হওয়ায় এবং সবসময় সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দেয়ায়, তাঁকে আমরা শত-সহস্রবার ভক্তিসহ সেলাম করি। তবে একদিন সালেক ভাইয়ের কর্মটা আমার মনে খুব পীড়া দিয়েছিল। ঘটনাটা খুলেই বলি:

ও-গ্রামের যে-কোনো বাগানের আমগাছ-জামগাছ ঘেটে বেড়ানো আমার অভ্যাস। আমাদের বাড়ির পাশেই বিশ্বেসবাড়ির আমবাগান। বাগানের পাশেই যেতে দেখি, একটা লাল-টুকটুকে পাকা আম পড়ে আছে। ওটা আমি কুড়িয়ে হাতের মধ্যে নিয়েছি। ভাবছি, বাড়ি গিয়েই আগে ওটা খাবো। সালেক ভাই আমার দিকে একবার তাকালেন। সাথে সাথেই বলে উঠলেন– তোর হাতে ওটা কী-রে? দেখি?

বলেই আমটা হাত থেকে নিয়ে পিছনের দিকে এক কামড় বসিয়ে দিলেন। জোরে দিলেন চোষণ। চোষণ দিয়েই চোখটা বুজে ফেললেন। মুখটা বিকৃত করে অবশেষে মুখাকৃতি বাংলা পাঁচের মতো করে বলে উঠলেন– উহ্! এত টক! একদম খাওয়ার মতো না। তুই এটা খেতেই পারতিসনে, তোর কষ্টটা আমি করে দিলাম। যা, এখন যা, যেখানে যাচ্ছিলি সেখানে যা।

আমটা কুড়াতেই আমার জিহ্বায় পানি আসছিল। খাবার ত্বরটুকুও সইছিল না। সেটা গেল এভাবে। 'বাকির কাগজ, গেল হুজুরে।' মনটা খারাপ হয়ে গেল।

যাকগে ওসব কথা। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুদূর গেলেই প্রাইমারি স্কুল। স্কুলের সামনে খেলার মাঠ। প্রতিদিন বিকেলে সেখানে খেলা করি। ওখানে একদিন মন্টু মিয়ার ম্যাজিক এলো। ঘটা করে প্যান্ডেল ঘিরে ম্যাজিক দেখানো

শুরু হলো। অন্যদের সাথে আমি ও আমার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রতি রাতের দর্শক। অতি আশ্চর্য ব্যাপার! আর আশ্চর্যান্বিত না-হয়ে উপায়ও নেই। একটা মানুষকে টেবিলে শুইয়ে পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে আনে। সেটা আবার সবাইকে দেখায়। দেখতেই গা শিউরে ওঠে। ছেলেটাকে আবার জাদুর কাঠি ঠেকিয়ে সুস্থ করে তোলে। কথা বলায়, ভিতরে নিয়ে যায়। একজনকে বাক্সবন্দি করে তালা মারে। তারপর জাদুর কাঠি ঘুরিয়ে উধাও করে দেয়। একটু পরে সে আবার একটা গাছের মাথায় বসে ভূতের মতো চিৎকার করে। কয়েকজন গিয়ে তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। অবাক কাণ্ড! একটা ছেলেকে চোখ বেঁধে কাঠের তক্তার সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়। দুই হাত দু-দিকে বাঁধে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় একটু দূর থেকে তার দিকে ছুরি ছুড়তে থাকে। একটা ছুরিও ছেলেটার গায়ে বেঁধে না, চারপাশের তক্তায় গিয়ে বেঁধে। অবাক না-হয়ে কি আর পারা যায়! আমার মতো তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরের জন্য এটা ছিল নিঃসন্দেহে তাজ্জব ব্যাপার। আমিও নাছোড়বান্দা। আমার উৎসুকতা মেটানো এত সহজ নয়! আমিও প্রতি রাতের বাঁধা খরিদ্দার। প্রথম রাতের পরের দিন সকালে চৌরাস্তায় বসে বেশ জোরেই বুদোই মণ্ডলকে বলতে শুনেছি– আরে, এ সবই হলো পাঁচ-আঙুলের প্যাঁচ, সবই হাতসাফাই। মানুষকে বোকা বানিয়ে, ধোঁকা দিয়ে টাকা আদায়ের ফন্দি।

কথাগুলো আমার আদৌ বিশ্বাস হয়নি। আর হবেই-বা কী করে? নিজের চোখ আর কানকে কি কেউ অবিশ্বাস করতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখলাম, বাক্সে ভরে তালা-মারা মানুষ উধাও হয়ে গাছের মাথায় বসে ভূতের মতো চিৎকার করছে। এটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিই কী করে!

আমি জানি জাদুবিদ্যা অনেক সাধনার মাধ্যমে গুরু ধরে দিনে দিনে সাধন করতে হয়। কিন্তু কার কাছে গিয়ে এটা শিখবো! শিখতে যে আমাকে হবেই। এটাই আমার মনের একান্ত বাসনা। ভাবতে ভাবতে মন্টু মিয়ার পিছ-পিছ দুদিন খুব ঘুর-ঘুর করলাম। উনি বিভিন্ন কথা বলেন, রসিকতা করেন, কিন্তু আসল

কথার উত্তর দেন না। আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। পাঁচ-রাত ম্যাজিক দেখিয়ে একদিন গাঁটরি-পেটরা বেঁধে, প্যান্ডেল গুটিয়ে মন্টু মিয়া অন্য কোথাও চলে গেলেন। তিনি গেলেন বটে, অন্তর শূন্য করে দিয়ে গেলেন। আমার অন্তরজুড়ে ধু-ধু বালুচর, মনে অজানাকে জানার মরুর পিপাসা। জীবনের একটাই সাধনা কীভাবে জাদুকর হওয়া যায়।

মনের ইচ্ছাটা সহপাঠী-বন্ধু রমাকে খুলে বললাম। সেও দেখলাম জাদুকর হতে চায়। তারও জাদুর খেলাগুলো খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু তার বাড়িতে অনেক বাধা। কেউ এ-পেশা মেনে নেবে না। আমার বাধাহীন উচ্ছন্ন জীবন। যেখানে রাত, সেখানে কাত। ঘরছাড়া-ছন্নছাড়া গোছের বেওয়ারিশ জীবন-যাপন; অনিরুদ্ধ চলাফেরা। কিন্তু তথ্য ছাড়া তো সব কিছুই অচল। যাব কোথায়! কোথায় গেলে মিলবে মনের মানুষ, পূরণ হবে মনের বাসনা! জাদুকর যে আমাকে হতেই হবে! রমা অনেক ভেবে-চিন্তে আমাকে বললো– চল, বিষয়টা নিয়ে সালেক ভাইয়ের সাথে শলা-পরামর্শ করি। উনিই সঠিক পথের দিশা বাতলে দিতে পারেন।

যথা বলা, তথা কাজ। দুজনে নিরিবিলি সময় বুঝে সালেক ভাইয়ের দ্বারস্থ হলাম। আমাদের অস্থিরতা দেখে উনি প্রথমত শান্ত হতে বললেন। আমরা আমাদের মনোবাসনা নির্দ্বিধায় খুলে বললাম। সব শুনে উনি মাথাটা নেড়ে বিচক্ষণতার ভঙ্গিতে শুধু বললেন– হুঁ।

তারপর মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন– তোদের দিয়ে এসব কিছু হবেটবে না। কাজটা এত সহজ না, অনেক কঠিন। অনেক-অনেক শক্ত সাধনা। আচ্ছা, আমি একটু বুঝে দেখি, আর এদিক-ওদিক একটু খোঁজটোজ নিই। সবই তোদের বলবো। কাল আবার আসিস।

অনেক দূরে হলেও একটা আশার আলো মিটমিট করে জ্বলতে দেখলাম। কিন্তু আগামীকাল? মনে হচ্ছে, সে তো ছয় মাস। রাত আর পোহায় না। অবশেষে আগামীকাল এলো। দুজনে সালেক ভাইয়ের কাছে গেলাম। এদিক-ওদিক

তাকিয়ে দেখে নিলাম কেউ আমাদের কথা শুনে ফেলবে কিনা। সালেক ভাই প্রথমেই বললেন– তোরা এসেছিস? বস, শোন। আমি তো অনেক খোঁজ-খবর নিলাম। কাজটা তো অনেক কঠিন। সাধনা, সবই সাধনা!

আমরা দুজনে একটু নড়েচড়ে বসলাম। দুজনের মনেই উৎসুকতা। সালেক ভাই বলে চললেন– আমাদের এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে, টানা দশ-বারো দিন হাঁটার পর ভারতের বর্ডার। বর্ডার পেরিয়ে আসাম রাজ্য। পুরোটাই পাহাড়ে ঘেরা। বন-বাদাড় আর পাহাড়। পাহাড়ি অঞ্চল আর কি! সেখানে কামরূপ-কামাখ্যা নামে একটা জায়গা আছে। পাহাড়ে বসেই জীবনভর সাধনা করছে এমন অনেক সাধক সেখানে আছে। বনের ফলমূল খেয়েই তারা বেঁচে থাকে। সে-বনে আছে অনেক হিংস্র প্রাণী, সিংহ। মাসের কোনো কোনো দিন সিংহ হুংকার-পেড়ে ডাকে। এ-ডাক পুরুষরা শুনলেই তৎক্ষণাৎ মহিলা হয়ে যায়। এজন্য সেখানে মহিলার সংখ্যাই বেশি। মহিলারা পুরুষগুলোকে আগেভাগেই মাটির গর্তে লুকিয়ে রাখে, যাতে সিংহের ডাক পুরুষদের কানে না যায়। সে এক আজব জায়গা। সেখানে তোদের যেতে হবে। মহিলারা তোদের দেখলেই লুফে নেবে। অনেক আদরযত্ন করবে। সাধকদের সাথে থেকে তোদের প্রথমত ছয় মাস অনেক সাধনা করতে হবে, মন্ত্র শিখতে হবে। সাধনা পূর্ণ হতে গেলে– এক অমাবস্যার তিথিতে, বিশাল জঙ্গলের মধ্যে একটা গভীর কুয়ো আছে, সেখানে তোদের নিয়ে যাবে। গোসল করে পূত-পবিত্র হয়ে সাদা কাপড় পরে সেই কুয়োর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সাধক মন্ত্র উচ্চারণ করবে। তোরাও সাথে সাথে তিনবার উচ্চারণ করবি। কুয়োর চারপাশে সাত পাক দিবি। তোদের হাতে একটা করে পাথর থাকবে। চোখ বুজে যেই পাথরটা কুয়োর মধ্যে ফেলবি, অমনি দেখবি কুয়োর মধ্য থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে উড়ে যাবে। বুঝবি তোদের ঈমানটাও ঐ কুণ্ডলীর সাথে চিরদিনের মতো আকাশে উড়ে গেল। তারপরও সাধকের কথামতো কমপক্ষে আধা-ঘণ্টা চোখ বুজে ঐ কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বুঝবি ঐ দিন থেকে তোরা বেঈমান হয়ে গেলি।

তোদের জাদুবিদ্যা সাধন হলো। তখন থেকে তোরা যা-ই বলবি, মুখে যা উচ্চারণ করবি, তা-ই হবে। তোরা হয়ে যাবি জাদুকর, বিখ্যাত জাদুকর। তোদের কথার তখন মূল্যই আলাদা। কেউ কেউ আজীবন ওখানেই থেকে যায়, কেউবা লোকালয়ে ফিরে আসে। মনে রাখিস, ওখানকার মহিলারা কিন্তু তোদেরকে ফিরে আসতে দেবে না। যদি শোনে, তোরা ফিরে আসতে চাস, তোদের মেরে ফেলবে। তোরা চাইলে, অতি গোপনে পালিয়ে আসতে হবে।

এমনই অনেক সাবধানবাণী শুনিয়ে, আরো কিছু উপদেশ দিয়ে সালেক ভাই একটু থামলেন।

আমাদের মনে তখন নতুন শিহরণ, রোমাঞ্চ শরীরের প্রতিটা লোমকে খাড়া করে তুলেছে। রক্তের প্রতিটা কণায়-কণায় সে শিহরণ সঞ্চারিত হচ্ছে। দুজনে সালেক ভাইয়ের কাছ থেকে চলে এলাম। আসার পথে রমা আমাকে বললো, সে যেতে প্রস্তুত। বিষয়টা আমার উপর নির্ভর করছে। আমি তখন উভয় সংকটে। বিকেলে স্কুলের খেলার মাঠে গেলাম। কিছুতেই খেলায় মন বসছে না। স্মৃতিপটে ভেসে আসছে মন্টু মিয়ার ম্যাজিক আর ভবিষ্যৎ কামরূপ-কামাখ্যা। 'মন হইয়াছে উড়া-পাখি গৃহেতে আর রব না– রব না' অবস্থা। রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি– সিদ্ধান্তে আসতে পারছিনে। সবকিছুই সম্ভব, সবই ভালো, কোনোকিছুতেই তো আপত্তি নেই। শুধু একটাতেই আপত্তি। মন্ত্রটা পড়ে কুয়োতে পাথরটা ফেলে দেয়ার পরপরই ঈমানটা আকাশে উড়ে যাবে কেন! আজীবন তাহলে কি বেঈমান হয়েই বাঁচতে হবে! বেঈমান হয়েই কি তাহলে মরতে হবে! তাহলে, পরকাল? এ কীভাবে সম্ভব! কিন্তু জাদুকর যে আমাকে হতেই হবে, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই অবচেতন মনে প্রতিক্ষণে ঈমান-বেঈমানের দোলাচলে অবিরাম দুলছি।

পরের দিন রমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসলাম। সে বললো– কাউকে কিছু জানানো যাবে না, বাড়িতে কিছু না-বলে পালাতে হবে। আর এক বছর পরে তো ফিরে আসবোই। তখন সবার সাথে দেখা হবে।

সামনে বিশাল সম্ভাবনা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জাদুকর হতে পারলেই হয়– বিশ্বটা আমার হাতে এসে যাবে। যা চাই তাই পাব, যা বলবো তাই হবে– এ এক অভাবিত অনুভূতি! আমিও রাজি হয়ে গেলাম। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করলাম। আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অতটা কম নয়। বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে গঞ্জ, সপ্তায় পাঁচ-সাত বার যাওয়া-আসা। প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে মহকুমা শহর। এ পর্যন্ত চার বার সেখানে সিনেমা দেখতে গেছি। ফলে বুকে বল বাঁধলাম, যেভাবেই হোক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাবে।

পরের দিন সকালে উঠে আগে পেটপুরে খেয়ে নিলাম। দুজনে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে সোজা অনিশ্চিতের পানে হাঁটা শুরু করে দিলাম। কত পথ হেঁটেছি তা জানিনে। হাঁটছি তো হাঁটছিই। দুপুর গড়িয়ে গেল, হাঁটার শেষ নেই। রমাকে বললাম– এই, খুব খিদে পেয়েছে।

ও বললো– আমারও তো।

রাস্তার পাশের টিউবওয়েলে মুখ লাগিয়ে দুজনে পেট ভরে পানি খেয়ে নিলাম। আবার হাঁটছি। কিছুদূর গিয়ে ও আমাকে বললো– এই, আমার-না খুব পা লেগে গেছে, একটু বসে নেয়া যাক।

দুজনে রাস্তার পাশে একটা বটের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসলাম। আমি বললাম– আচ্ছা, বেলা তো বিকেল হয়ে এলো, তারপর তো সন্ধ্যা লাগবে– রাতে থাকবো কোথায়? তারপর খাওয়া-দাওয়া?

দুজনে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর রমা বললো– এই, আমার খুব ভয়-ভয় করছে। না-হয় চল আজকের মতো বাড়ি ফিরে যাই– এখনও সময় আছে।

প্রথমত আমি কিছুটা ইতস্তত করলাম, তারপর কোনো এক অজানা আশঙ্কায় সমস্ত স্বপ্ন-সাধনাকে পিছু ফেলে আপাতত বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। তখন আর হেঁটে নয়, মোটামুটি দৌড়ে। কত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছানো যায়, এটাই তখন লক্ষ্য।

বাড়িতে পৌঁছাতে বেশ রাত হয়ে গেল। এদিকে সন্ধ্যা থেকে সবাই উদ্বিগ্ন। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি চলছে। অনেক রাতে আমাকে পেয়ে সবারই এক প্রশ্ন– সারাদিন কোথায় ছিলে? এত রাত কেন? কেউ বলছে– ছেলেটা বখে শেষ হয়ে গেছে।

আমি নিশ্চুপ। আমার জাদুকর হবার শখ-সাধনা ওখানেই অঙ্কুরে বিনাশ।

জীবন ও সময়ের সাথে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় হয়েছি। সালেক ভাই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি স্কুলটা পুরোপুরি কোনোদিনই ছাড়িনি। ঢিমেতেতালা গোছে কোনোরকম সামনে গেছি। অকাজ-কুকাজে যথেষ্ট উদ্যম, উচ্ছলতা দেখিয়েছি। কখনও জীবনের নির্মম বাস্তবতার ঘা খেয়ে জীবনকে বুঝতে শিখেছি। কখনো-বা পিছনের অঙ্গ-পড়ে-যাওয়া চতুষ্পদের মতো সামনের দু পায়ে ভর করে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে সামনের দিকে নিয়েছি, কখনো-বা পড়ে পড়ে ধুঁকেছি।

কয়েক বছর পর দিনে দিনে বুঝেছিলাম, সালেক ভাইয়ের বলা কাহিনীটা ছিল আসলে একটা লোককাহিনী। বাস্তবে এর তুলনা মেলা ভার, আবার অতুলনীয় বললে ভুল হবে, মনে অতৃপ্তি রয়ে যাবে। সেই হতেই আমার খোঁজা হলো শুরু। জীবনের মায়াময় নিবিড় কর্ম-কানন, পরতে-পরতে খোঁজা– এ কাহিনীর বাস্তব প্রয়োগ কোথায়! কাহিনী থাকলে সমাজে তার প্রতিচ্ছবি তো থাকবে। জীবনের পথে-পথে পথ খুঁজে ফেরা বাউণ্ডুলে পথিক আমি। জীবনের গতিপথ খোঁজা আমার নেশা। সমাজ-জীবনের প্রতিটি ভাঁজে-ভাঁজে আমি প্রতিটি বিশ্বাসকে, ঘটনাকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে চাই, বুঝতে চাই, মেলাতে চাই। উপমা ও উপমেয় জানতে চাই। এই আমার সাধনা, এই আমার পথ চলা।

কালক্রমে মাস্টারসাহেব হয়েছি। কথায় আছে, 'যার নেই কোনো গতি, সে করে পণ্ডিতি।' পণ্ডিত শব্দের ব্যবহার বর্তমানে কমে গেছে। আগে বলতো পণ্ডিতমশায়। এখন গ্রামে গেলে বলে, মাস্টারসাহেব। আসলে আমি একজন

শিক্ষক, কলেজশিক্ষক। অনেক বছর হলো এ-পেশাতে আছি। শিক্ষকতা আমার পেশা, আমার ব্রতও বটে। শিক্ষা দেয়া আমার ধর্ম ও কর্তব্য। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তি হচ্ছে। কলেজে এইচএসসি থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশুমার। প্রতিনিয়ত নবীন-বরণ এবং বিদায় অনুষ্ঠান– 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।' মাস্টার মানুষ– ছাত্রছাত্রীদের পথ চেয়ে বসে থাকি। 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।' তাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখছি, সুনিবিড়ভাবে প্রতিটা পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করছি। সুশিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করছি। তাদের কর্মপন্থা প্রতিনিয়ত গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছি। কাছে ডাকছি, ভালো-মন্দ খোঁজখবর নিচ্ছি। প্রয়োজনে শাসন করছি। আপাতদৃষ্টে কোনো ছাত্রছাত্রী আমার কোনো ব্যবহারে কিংবা রূঢ় আচরণে নাখোশ হতে পারে। এটা তার সাময়িক অপরিণত চিন্তাধারা, কিন্তু বয়সের পরিপক্কতায় নিশ্চয়ই বুঝবে যে, আমি যা করছি, তা তার ভবিষ্যৎ ভালোর জন্যই করছি। তাদেরকে গড়ে তোলার এ-এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। কখনো সার্থক, কখনো বিফল হচ্ছি। কেউ বড় হলে মানসিক তৃপ্তি, 'তোমাকে করেছি বড় এই গর্ব মোর'।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদীয়মান, সম্ভাবনাময় সোনার টুকরো ছেলে-মেয়ে সময়ের স্রোতে ভেসে আসছে। মা-বাপ বুকভরা আশা নিয়ে সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিজের মনে আঁকছে। স্বপ্ন আমিও দেখছি।

ছাত্রছাত্রীদের উঠতি কাঁচা বয়স, মানসিক চঞ্চলতা অনেক বেশি। এদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারলেই কেবল সম্পদে পরিণত হবে। এরাই একদিন বড় হবে, সুশিক্ষিত হবে, আদর্শবান মানুষ হবে, সমাজের উন্নতি করবে, দেশ ও দশের মঙ্গল হবে– এই আমার প্রত্যাশা।

আমার ডিপার্টমেন্ট অফিস-বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায়। বসার রুম থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত দেখা যায়। বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ পাশে কলেজের বিশাল খেলার মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে কলেজ থেকে প্রধান সড়কে যাবার রাস্তা। রাস্তার শেষ

মাথায় কলেজের বড় একটা গেট। গেটে কলেজের নাম লেখা। আমি নিজ রুমে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আনমনে খোলা মাঠ, গেট ও রাস্তার দিকে একদৃষ্টে অনেক্ষণ তাকিয়ে আছি। অগণিত ছাত্রের ঢেউ– আসছে, যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের ঠিকানায় তারা যাচ্ছে। সহসা মাথায় সালেক ভাইয়ের স্মৃতি নাড়া দিল। উদাসী দৃষ্টিতে দেখছি, আর ভাবছি। মনে হচ্ছে কবিতা লিখি, ভাবুক কবি হতেই মন চাচ্ছে। কবিতা একটা মনে এলো, ভাষাটা একরম–

বিধাতা তোমার লীলা বোঝা বড় ভার,
সাধ দিয়েছিলে জাদুকর হবার– করেছ মাস্টার।
সবি স্বচক্ষে দেখালে তুমি, এনে এই ঠাঁই,
কেন তুমি ঠেলে দাও বৃথা 'কামরূপ কামাখ্যায়'?

ছাত্রছাত্রীরা আসছে। কয়েক বছর থাকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। এ-এক অবারিত স্রোতধারা। অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে অজানা কোনো হাতছানিতে ধরা দিচ্ছে, কোন-সে টেরা-চোখের নিবিড় ইশারায় সাড়া দিচ্ছে। আমার মতো জাদুকর হবার সাধনায় নিমগ্ন হচ্ছে। সাধক-গুরুরা সাগরেদ ধরার ফাঁদ পেতেছে এখানে। ভজন-সাধনের হাতেখড়ি দেবার এই তো উপযুক্ত সময়। 'শিক্ষানবিশ-সাধক'রা 'পাতি-সাধক'দের সাথে সুরে সুর মিলিয়ে বিশেষ বিশেষ নামে বাতাস বুঝে স্লোগান দিচ্ছে। সাধক-গুরুরা নিজেদের ভিজিটিং কার্ড শিক্ষানবিশদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন দোকানে বা বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে 'পাওনা' আদায়ের জন্য পাঠাচ্ছে। ভর্তিবাণিজ্য করে ফসল ঘরে তুলছে। টেন্ডারবাজিতে অংশ নিচ্ছে। যা আদায়-রোজগার হচ্ছে একটা অংশ নিজের পকেটে রাখছে, বাকিটা গুরুকে দিচ্ছে। বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলার ছবক নিচ্ছে। ভাষার স্টাইল পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষকদের একটা অংশ পৃষ্ঠপোষকতা করছে। স্লোগানে স্লোগানে পুরো কলেজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মুখরিত করে তুলছে। সাধক-গুরুরা স্লোগানের সময় সাগরেদদের পাশে পাশে রাখছে। কিরিচ, রামদা, রিভলবার চালানোর ট্রেনিং দিচ্ছে। বোতল-টানার

অভ্যাস করাচ্ছে। সাধনকাজে ট্রেনিং নিতে গিয়ে ধরা পড়লে গুরুর গুরুরা ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছে। পুরো প্রক্রিয়াটাই এক অবিশ্বাস্য জলজ্যান্ত তেলেসমাত। জাদুকর তৈরির এ-এক আজব ট্রেনিং সেন্টার! এভাবে ছয় মাস ট্রেনিং পাওয়ার সাথে সাথে স্বদেশীয় 'মানুষ-রতন উন্নয়ন-ধারার অন্ধকুয়ো'র চারপাশে সাত-পাক দিলেই দিনে দিনে ব্যক্তিচরিত্র, বিবেক, সততা, মানবিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, দেশাত্মবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসার মতো সাতটি গুণ কোথায় যেন আকাশের অসীম নীলিমায় অজানার উদ্দেশ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। শুধু সাধন-গুরু ভক্তিটাই রয়ে যাচ্ছে।

পাতি-সাধকরা কলেজ পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে নিজ নিজ ঠিকানায়। ধীরে ধীরে বড় মাপের সাধকে পরিণত হচ্ছে। তখন সে-ই হচ্ছে বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান। তার হাতের পাঁচ-আঙুলের মারপ্যাঁচ মন্টু মিয়ার ম্যাজিককেও হার মানায়। জাদুর কাঠি ঠেকিয়ে যা বলে তাই হয়। এমনই কত-শত হাজারে-হাজার সোনার ছেলেকে এদেশে পাতিসাধক, সাধনগুরু এবং পরিণামে বৃহৎ পরিসরে মহাসাধক হতে দেখলাম, তার কোনো ইয়ত্তা এই নগণ্য মাস্টারসাহেবের কাছে নেই। এই সাধকদের কেউ কোনো দুর্বিপাকে কিংবা ক্রসফায়ারে পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ করলে, আশপাশের দোকানে এবং ব্যবসায়ী মহলে মিষ্টি বিতরণ উৎসবের আয়োজন হয়, মুখে ফোটে গোপন হাসি, যে হাসি মোনালিসার হাসিকেও হার মানায়।

আমার প্রধান কাজ এখন দখিনা জানালায় বসে এই অবিরাম স্রোতধারার নিবিড় পর্যবেক্ষণ। আর পুরো জাদুকর-তৈরি চক্রটাকে ছহি-নিয়তে বোঝা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। এভাবে সাধন করতে করতেই তো পরিণামে সুবিখ্যাত মহাসাধক হওয়া যায়। এই সাধনে আছে রে-মন, যারে বলে দুনিয়া সাধন, মাস্টার বলে– হারিয়ে সে-ধন, ফিরিসনে সুপথে, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'।

মনে মনে বিধাতার কাছে শুকুর গুজার করছি আর বলছি– বিধাতা তুমি কোথায়! তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝা বড় দায়! তুমি আমার ঘরকে করেছো 'কামরূপ-

কামাখ্যা'। স্বয়ং আমার নিজের ঘরে বসে তুমি এত খেলা দেখাচ্ছো, আর অলক্ষ্যে হাসছো– অথচ আমি খুঁজে মরছি এতটা বছর ধরে কোন-সে বন-বাদাড়ে, পথে পথে, কোন-সে দূরান্তরে, বিভূঁই বিদেশে।

ভাবছি, সালেক ভাইয়ের কাছে ফিরে যাব। তিনি হয়তো চেতনাহীন অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তবু তাঁকে বলবো– ভাইজান বিদায় নেবার আগে একবার শুনে যান, আপনার ভাবনার প্রপজিশন-পসটিউলেট আপনার শিষ্য আজ এতদিন পরে খুঁজে পেয়েছে। আমি পেয়েছি সত্যের সন্ধান। আপনার সুযোগ্য শিষ্যত্ব বরণ করে আমি ধন্য, আমিও আপনার বর্তমান পথ অনুসরণ করতে চাই।

'ইউরেকা– ইউরেকা।' "জন্ম আমার ধন্য হলো, মাগো– অমন করে আকূল হয়ে আমায় তুমি ডাকো।"

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আশরাফ আলী কথনিকা

পাহাড়ি ঝরনাধারা যেমন স্তিমিত হয়ে আসছে, নদীর গতিপথ যেমন সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে, আশরাফ আলীর চিন্তা-চেতনা, পেশা ও কর্মক্ষেত্রের গতিপথও দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে আসছে। আশরাফ আলী এতক্ষণ হাতটা কপালের উপর রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন, এবার তিনি হাতখানা কপাল থেকে নামিয়ে পাশে রাখলেন। ক্রমশই তিনি জীবন-চলার পথে খেই হারিয়ে ফেলছেন। তিনি যে-পথে যেতে চান, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তাকে এর বিপরীত দিকে টানছে। চলার পথে তাঁর বাধা-বিপত্তি অনেক। ঝুঁকিবহুল তাঁর জীবন। তিনি এখন শুয়ে-শুয়ে সেই চিন্তাই করছেন। তাঁর জন্য হয়তো আরো নিগ্রহ, অপমান অপেক্ষা করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর করার কিছু নেই।

তাঁর স্বভাব, বৈশিষ্ট্য, ভালো লাগা, না-লাগা, পছন্দ-অপছন্দ সবই তো তাঁর প্রকৃতিগত। সেটা তো তিনি ইচ্ছে করলেই পরিবর্তন করতে পারেন না। মানসিক দ্বন্দ্বের কাছে, নৈতিকতার কাছে, লালিত মূল্যবোধের কাছে, বিবেকের কাছে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই হেরে যান। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তিনি তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না। অন্যায়ের সাথে কোনোমতেই আপস করেন না। তখনই তিনি হোঁচট খান, দুশ্চিন্তা এসে বাসা বাঁধে। অনেক ভেবেচিন্তে, পা টিপে টিপে তিনি পথ চলেন। তবু দুর্নাম ও কলঙ্ক থেকে বাঁচতে পারেন না।

অনেক সময় আশরাফ আলী তাঁর ঘনিষ্ঠ সহমর্মী-সহকর্মীদের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা তাঁকে সাহস জোগান, বিপদে-আপদে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। আশরাফ আলী ধোঁয়াশাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় আশার আলো

খুঁজে পান, আবার সামনে এগোন। আশায় বুক বাঁধেন। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে।

যে সমাজে নৈতিক শিক্ষা অনুপস্থিত, ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক মূল্যবোধ তলানিতে পৌঁছেছে, সেখানে আশরাফ আলীর মতো জ্ঞানপিপাসু, আলোকিত লোকের মূল্যায়নও হাতে-গোনা থমকে-যাওয়া কিছু লোকের নিভৃত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া স্বভাব বলতে তো একটা কথা আছেই। ভালো স্বভাবের লোক সব সময় কোনো জিনিসের ভালো দিকটাই নেবে, ভালো চিন্তাই করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর খারাপ প্রকৃতির লোক অনুকূল বাতাস পেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে, কুমতলব আঁটবে। কীভাবে সুবিধাটা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, সে চেষ্টাই করবে। এক্ষেত্রে ওস্তাদ যদি দাঁড়িয়ে কীর্তন গাওয়া শুরু করে, তাহলে সাগরেদদের সুবিধা বেড়ে যায়, তারা আবার পাক দিয়ে নাচে, আসর জমিয়ে তোলে।

আশরাফ আলী পুরোনো বইপত্র ঘাটাঘাটি করা লোক। প্রত্যেকটা কথারই অর্থ খোঁজেন, উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি জানতে চান, ব্যাখ্যা করেন, পাণ্ডিত্য ফলান– এটা তার স্বভাব। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা 'বানু মোল্লার শায়েরি' তিনি পড়েছেন। বইটার অনেক শায়েরি তাঁর এখনও মনে পড়ে, যেমন– 'যার যে স্বভাবদোষ না-যায় কখন, হাজার কষেতে ঘোল না-হয় মাখন;' 'গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে না খালি লোহার ছুরি।' আসলে গড়ে ওঠার সময়ে যদি সুশিক্ষা, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের অন্তরে ঠিকমতো প্রোথিত না হয়ে থাকে, তাহলে বড় হলে তাকে মানুষরূপী অমানুষ ছাড়া আর কিছুই বলার থাকে না।

একজন অমানুষ তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে তার চেয়ে অধিক শক্তিধর অন্য অমানুষকে খুঁজে ফেরে। তার কিংবা তাদের আশ্রয়ে মদদপুষ্ট হয়ে এরা সব ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যায়, আর পিঠ বাঁচানোর জন্য নিজের পক্ষে কৃতকর্মের কিছু হাস্যকর যৌক্তিকতা তুলে ধরে। সমাজের চাহিদামতো কিছু টপকা কথার বুলি মুখে আওড়ায়। এটাও তার স্বভাব। সতীর্থরা তাতেই হাততালি দিয়ে কর্তাভক্তি

করে। সাগরেদবর্গ অনুকূল বাতাসে পাল তুলে নিয়মনীতিহীন সমাজে টাউটারি করে সদম্ভে টিকে থাকে এবং সমাজের রক্ত চুষে চুষে খায়। আর বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বর্তমান সাহিত্যরথী পর্যন্ত বাংলাভাষাকে এমনভাবেই সমৃদ্ধ করেছেন যে, ভাষা প্রকাশের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। আত্মজিজ্ঞাসাও নেই, লজ্জা-শরমও নেই। মনের যে কোনো কথাকে সত্য-মিথ্যা জ্ঞান না-করে টাউটদের পক্ষে সবই সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা সম্ভব, কোনো কিছুই অব্যক্ত থাকে না।

আশরাফ আলী এসব অন্যায়কে কেন জানি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তার স্বভাবটাই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে– যেমনিভাবে কাঠ আজীবন কাঠ, লোহা আজীবন লোহা, কৃপণ ব্যক্তি আজীবনই কৃপণ। 'যার যে স্বভাব, যায় না সে-ভাব।' বাতাস অনুকূল হলে খারাপ স্বভাবের লোকগুলো সব এক জায়গায় জড়ো হয়। কথায় আছে না, 'একই পাখাওয়ালা পাখি সব এক জায়গায় জড়ো হয়'– সে রকম। আশরাফ আলীর আবার 'বানু মোল্লার শায়েরি' মনে পড়ছে– 'কুকুরের হয় সুখ ছাইয়ের গাদায়, শূকরের হয় সুখ পিচ্চট কাদায়।' অপকর্ম-পিপাসু লোকগুলো সতীর্থদের নিয়ে পিচ্চট কাদায় নিরন্তর মাখামাখি করছে এবং জ্ঞানী-সত্যাশ্রয়ী লোকগুলোর গায়ে কাদা ছিটিয়ে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে আশরাফ আলীরা দিনকে দিন সমাজে খুব সংকুচিত হয়ে পড়ছে। বদ-খসলত লোকের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি এমনই আকার ধারণ করেছে যে, আশরাফ আলীদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে হতে ক্রমেই ক্ষীণতর হচ্ছে এবং কেউ কেউ নিভৃতে বসে হাঁপানি রোগীর মতো পড়ে পড়ে ধুঁকছে। সমাজ-সচেতন সত্যাশ্রয়ী লোকগুলো এদেরকে ঠিকই চেনে, কিন্তু চলমান 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' পরিস্থিতিতে করার এবং বলার কিছুই থাকে না। সত্যের জীবনপ্রদীপ মিথ্যার ভ্রূকুটিতে ও অসত্যের প্রবল ঝড়াবর্তে আজ নিপতিত।

আশরাফ আলী ধীরস্থির স্বভাবের লোক। নিজের ব্যক্তিত্বকে কোথাও বিকিয়ে দিতে চান না। মিথ্যার কাছে মাথা নত করেন না, সুযোগসন্ধানীও নন। শিক্ষার মশাল হাতে নিয়ে জ্ঞানের মিছিলে অগ্রপথিক। পয়সাকড়ি তেমন না থাকলে কী হবে, তিনি জানেন তাঁর মহৎ পেশার স্বীকৃতি তিনি একদিন পাবেনই। আপামর জনগোষ্ঠী তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করবে না। এ আত্মবিশ্বাস

নিয়েই তিনি এ এলাকায় একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। সেও আবার পঁয়ত্রিশ বছরের কথা। এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার। দিনে দিনে স্কুলের কলেবর বেড়েই চলেছে। কয়েক বছর আগে স্কুলটি দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। আশরাফ আলীর সততা, একনিষ্ঠতা, সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা তাঁকে অনেক বড় করেছে। তিনি এলাকার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। স্কুলের পরিধিও অনেক বেড়েছে। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, নতুন নতুন বিল্ডিং হয়েছে। স্কুলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। শিক্ষা বোর্ডে প্রতি বছর এ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে। আশরাফ আলী তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছেন ।

প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য ব্যাপক প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন ভর্তি-কোচিং সেন্টারে এ স্কুলের ভর্তি-কোচিং করানো হয়। ভর্তির এ প্রতিযোগিতায় ভালো-ভালো ছাত্রছাত্রী বেছে নিতে আশরাফ আলীর বেশ ভালোই লাগে। ভর্তি এবং শিক্ষক নিয়োগে কোনো স্বজনপ্রীতি তিনি বরদাস্ত করেন না। তিনি বোঝেন, অল্প কিছু সংখ্যক অযোগ্য শিক্ষকও যদি কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে স্কুলে ঢুকে পড়তে পারে, তো ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর ঐ শিক্ষকগুলো যদি এখানে ত্রিশ বছরও শিক্ষকতা করে, তাদের অবিদ্যা-অজ্ঞতা ও দলবাজির জের পুরো সময়টা ধরেই শিক্ষার্থীদের বহন করতে হবে। এর প্রভাব এলাকার শিক্ষার পরিবেশের উপর বিস্তার লাভ করবে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জীবন গড়ার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবে। আশরাফ আলীর মত হচ্ছে, একজন নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষকই একটা বিদ্যাপীঠকে অবলম্বন করে ঐ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে সুশিক্ষা দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর জীবনে পৌঁছে দিতে পারেন। যেনতেন শিক্ষাধারী এবং মতলববাজ, দলবাজ শিক্ষক স্কুলে ঢুকে পড়লে পরিবেশও বিঘ্নিত হয়, ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষাও শেষ হয়ে যায়। এলাকার উন্নয়নে এর খারাপ প্রভাব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, শিক্ষকতা শুধু একটা

মহৎ পেশাই নয়, একটা ব্রতও বটে। এটা নিয়ে বাণিজ্য, রাজনীতি চলে না। এর পরিণামে সমগ্র জাতি ধ্বংস হতে বাধ্য।

কিন্তু বাঘের পিছে ফেউ লেগে থাকা অমূলক নয়। দীর্ঘদিন ধরে একটা কুচক্রী-মহল তথাকথিত রাজনীতির ছায়াতলে আশরাফ আলীর পিছনে লেগে আছে। তারা স্কুলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চায়। আশরাফ আলী ভালোই বোঝেন, তাদের ক্ষুধার্ত-লোভাতুর দৃষ্টি স্কুলের কিছু সম্পদের উপর পড়েছে। তারা স্কুলের সুনামকে পুঁজি করে তা বিকিয়ে দিয়ে টাকায় রূপান্তর করে সুবিধা লুটতে চায়। আশরাফ আলী ছা-পোষা মুরগির মতো করে স্কুলের সমস্ত সম্পদ, সুখ্যাতিকে ডানা মেলে আগলে ধরে রেখেছেন। ফলে সুবিধাবাদীরা সুবিধা করতে পারে না– দূরে দূরে থাকে, জিব চাটে, আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন অজুহাতে ফায়দা লোটার কৌশল আঁটতে থাকে। বিভিন্ন কুটিল-জটিল কথা ছুড়ে মারে আর বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে।

আশরাফ আলী এই অপশক্তিকে পাত্তা দেন না। কোনো কোনো সহকর্মী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, একটু সতর্ক হতে বলেছেন, আরেকটু ট্যাক্টফুল হতে বলেছেন। সুজন-কুজন সবার সাথে ভাব রাখতে বলেছেন। আশরাফ আলী ওদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনি জানেন, এ যুগে ট্যাক্টফুল হওয়া মানেই মিথ্যার সাথে গোপনে আপস, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ, গোঁজামিল নীতি। 'না-ঝোল, না-চচ্চড়ি'র মতো। 'বাইরে ফিটফাট, ভিতরে লুটপাট' কিসিমের। উপর উপর নিয়ম-নীতির কথা ফলাও করে বলা, আর ভিতরে ভিতরে দুর্নীতির আখড়া জমানো। এ ধরনের ট্যাক্টফুলনেস আশরাফ আলী মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় বলে, কুজনকে সঙ্গে রাখা দায়। কাছে আসার সুযোগ পেলেই সে তার কুমতলব কোনো না কোনোভাবে চরিতার্থ করবেই। অবৈধ আবদার করতেই থাকবে, সুবিধা নিতে চাইবে, তার সাথে আরো কুমতলবওয়ালা লোকজন কাছে ভিড়বে। তখন তাদের অবৈধ প্রস্তাব একবার গেলাতে পারলেই বিষয়টা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়টা তখন শাঁখের করাত আকারে রূপ নেবে। আশরাফ আলীর আবার 'বানু মোল্লার শায়েরি' মনে পড়ছে, 'খলে ছাড়ে না খল-বুদ্ধি চ্যাঙে ছাড়ে না ঘাই, কুত্তার লেজে তেল মাখালে আরো বাঁকা হয়।' তার

চেয়ে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাটাই ভালো। দূর থেকে শত্রুতা করে সহজে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু ঐ পক্ষটা আশরাফ আলীকে শান্তিতে কাজ করতে দেয় না। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কখনো অনুদানের নামে, কখনো সাহায্যের নামে চাঁদা দাবি করে। শিক্ষক নিয়োগের সময় টাকার বিনিময়ে তাদের লোক স্কুলে ঢোকানোর জন্য আশরাফ আলীকে চাপ অব্যাহত রাখে। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সময় কোনো কোনো রোল নম্বর দিয়ে স্লিপ পাঠায়। ভর্তি করানোর জন্য চাপ দেয়। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে টাকা আদায় করে। প্রতারণার ফাঁদ পাতে। আশরাফ আলী তাঁর সহকর্মী ও স্কুল কমিটিকে নিয়ে বিষয়গুলো মোকাবিলা করেন। যথাসম্ভব 'থাকিতে আমামা, নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী' মনোভাব নিয়ে চলেন।

দু বছর আগে 'কে বা কারা' আশরাফ আলীর নামে স্কুলে পোস্টারিং করেছিল। তাদের ভাষায়, 'আশরাফ আলী দুর্নীতি করে স্কুলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে'। সকালে স্কুলে এসে তিনি এগুলো দেখেছিলেন, মনঃকষ্টে ভুগেছিলেন; তারপর দপ্তরিকে দিয়ে পোস্টারগুলো উঠিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সমাজের অবক্ষয়টা কোথায়। আজ তিনি যদি প্রকৃতপক্ষেই দুর্নীতি করতে পারতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আর দুর্নীতির অভিযোগ আসতো না, বরং সৎলোক নামের ছাপানো সার্টিফিকেট ফলাও করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো-এক বড় মাপের নেতা এসে ফুলের মালাসহ দিয়ে যেত। এটাই এ-দেশের অলিখিত বিধান, নিয়তির নির্মম পরিহাস। 'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' ওতে আশরাফ আলী মুষড়ে পড়েননি, বরং হুংকার দিয়ে শিক্ষকদের মিটিংয়ে বলেছেন– বাপের ব্যাটা হোস তো সামনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে কথা বল, গোপনে গোপনে পোস্টারিং কেন?

আশরাফ আলীর মনোবলই তো প্রকৃত বল। তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করেন না। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, তিনি সৎভাবে স্কুলের প্রতিটি পয়সা ব্যয় করছেন। শিক্ষার উন্নয়নে যতটা তাঁর পক্ষে সম্ভব, তা নিরলসভাবে করে যাচ্ছেন।

আশরাফ আলী যদিও আত্মশক্তিতে বলীয়ান, তবু প্রতিপক্ষ শব্দটা শুনলেই মনের অজান্তে তাঁর বুকটা কেঁপে ওঠে। স্কুলের জন্য অশনি সংকেত শুনতে পান– তাঁর কানে বাজে নিরাশার সুর। যারা এই স্কুল নামের সম্পদটাকে গ্রাস করতে চায়, তাদের শক্তি অসুরের শক্তিকেও হার মানায়। তাদের নেতার নাম 'কামেল হোসেন তরফদার'। এ এলাকার লোক তরফদারের নামটা শুনলেই অন্তত একবার 'দোয়া ইউনুস' পড়ে বুকে ফুঁ দেয়। আশরাফ আলী প্রতিটি নামের ব্যাখ্যা খোঁজেন, শব্দের উৎপত্তি ঘেঁটে দেখেন। আভিধানিকভাবে আরবি 'তরফ' এবং ফার্সি 'দার' শব্দদ্বয় থেকে 'তরফদার' শব্দটার উৎপত্তি। অর্থ, 'তরফের রাজস্ব আদায়কারী লোক' অর্থাৎ 'গোমস্তা'। যথাযথ পদবি বটে। তাকে সমীহ করে চলে না এমন লোক এ চৌহদ্দীতে বিরল।

এ অঞ্চলে কামেল হোসেন তরফদারের উত্থান রাজনৈতিক 'কামেল-গুরু'র শিষ্যত্ব অর্জনের মাধ্যমে। স্বয়ং 'সাধনগুরু' কোনো প্রয়োজন পড়লে তাকে ডেকে কথা বলেন। এ বৃহৎ শহরের প্রায় বিশ বর্গকিলোমিটার এলাকার 'আধিপত্য, ভূস্বামীত্ব ও কর্তৃত্ব' 'সাধনগুরু' স্বয়ং তাকে দিয়ে রেখেছেন। কামেল হোসেন 'সাধনগুরু'র হাতে হাত রেখে রাজনৈতিক তরিকায় বয়েত হয়েছে। ফলে তার শক্তি সীমাহীন, অচিন্ত্যনীয়। এলাকার দুর্মুখেরা আড়ালে-আবডালে তাকে 'কামেল বাবা' বলে সম্বোধন করে। আসলে 'কামেল বাবা'র কামেলত্ব অর্জনের মোজেজাই আলাদা।

'আধিপত্য' শব্দটার মূল সংস্কৃত শব্দ 'অধিপতি'। 'কামেল বাবা' নিজে 'কামেল' হওয়াতে এ অঞ্চলের সকল বাতেনি ক্ষমতার অধিপতি। তার কথার নড়চড় হতে কেউ কখনো দেখেনি। 'বাবা' যা করবে তা-ই হবে, নইলে মস্তক ঘাড়ে নিয়ে ঘোরাফেরা করা কষ্টদায়ক। তার দোর্দণ্ড প্রতাপে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও নির্বিকার, নতশির। বৃহৎ ঠ্যাঙানো-দুরমুশ বাহিনীর পুরো কর্তৃত্ব তার হাতে। এই ঠ্যাঙানো-দুরমুশ বাহিনীর মাধ্যমে দখলস্বত্বে প্রচুর 'ভূ'-এর 'স্বামীত্ব' সে অর্জন করেছে। 'কর্তৃত্ব' শব্দটা 'কর্তা' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'করে যে' বা 'করানোর ক্ষমতা যার হাতে'। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব অর্থ 'প্রভুত্ব, নেতৃত্ব, নায়কত্ব'। দলীয় সূত্রে সে 'মহাগুরু'র কাছ থেকে 'কর্তৃত্ব' ফলানোর

'কর্তৃত্ব' পেয়েছে। 'কামেল বাবা' বিদ্যুৎ গতিতে সকল অপকর্মে তার বাহিনী নিয়ে যে কোনো প্রতিপক্ষের উপর সদম্ভে উৎসাহভরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তাই অত্র এলাকার একজন 'বিদ্যোৎসাহী' ব্যক্তিত্ব। পদাঘাতের জন্য পৃষ্ঠদেশও হন্যে হয়ে খোঁজে, ত্রিকালজ্ঞ বায়সকূলপতি, তাই সকল কিছু বোঝে। তার কর্তৃত্বাধীন এলাকার মধ্যে কোন জমিতে কোন কোন বিল্ডিং উঠছে, তা তার নখদর্পণে। সেখান থেকে 'রাজস্ব' তথা বর্তমানে রূপকার্থে 'পাওনা' আদায়ের একমাত্র রাজত্ব তার। এ অঞ্চলের যাবতীয় শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তাবৎ মাসোহারা আদায়ের সার্বভৌম ক্ষমতা সে রাখে। এহেন 'বিদ্যোৎসাহী' ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্বকে অবহেলার চোখে দেখে শুধু নৈতিক মনোবল ও শিক্ষাশক্তির উপর ভর করে আশরাফ আলী হেডমাস্টার যে কীভাবে তাঁর জীবন-মরণ সমীকরণ মেলানোর পন্থা খুঁজছেন, তা ভাবতেই হেডমাস্টার সমর্থিত সবারই বুকটা দুরুদুরু করে ওঠে।

এতদিনে অসুবিধা হলেও আশরাফ আলী এতটা দুশ্চিন্তায় পড়েননি। দুশ্চিন্তার মূল কারণ অন্য কোথাও। এবার নিয়মানুযায়ী 'কামেল বাবা' পদাধিকার বলে স্কুলের সভাপতি হয়ে এসেছে। আগামী দশ দিন পর স্কুল কমিটির মিটিং ডেকেছে। কমিটিতে 'কামেল বাবা' নিজে তার পছন্দের লোকগুলোকে রেখেছে। তাই আশরাফ আলীর মাথায় হাত উঠেছে। 'কামেল বাবা' এবার আশরাফ আলীকে হাত দিয়ে না-ধরে সাঁড়াশি দিয়ে ধরেছে। আশরাফ আলী এবার যাবেন কোথায়!

আশরাফ আলী বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে বসলেন। কোনো কূল-কিনারা করতে পারছেন না। স্কুল ছেড়ে চলে আসতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নৈতিকতা বিসর্জন তিনি কোনোমতেই দেবেন না। তবে তাঁর একটাই চিন্তা– এতদিনে তিলে তিলে গড়া স্কুলের কী দশা হবে! কামেল হোসেন উন্নতির ডামাডোল বাজিয়ে স্কুলের সমস্ত সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর চাটুকার, সুবিধাবাদী লোকগুলোকে নিয়োগ দেবে, লুটপাট-বাণিজ্য শুরু হয়ে যাবে। কালক্রমে এ অঞ্চলের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী মানসম্মত শিক্ষা বঞ্চিত হবে। তবে কামেল হোসেনের রাজত্বে একদিন ভাটা পড়বে, ক্ষমতার পালাবদল হবে কিন্তু স্কুলের হারানো গৌরব ও মান আর ফিরে আসবে না।

এভাবেই তরফদার গংয়ের স্পর্শে এ-দেশের প্রতিটা প্রতিষ্ঠান দিনে দিনে তার মান, গৌরব ও বিশ্বস্ততা হারিয়েছে। সবকিছুই আজ ঠুঁটো জগন্নাথ, আর পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এসব কথা ভাবতে আশরাফ আলীর মাথা আর কাজ করছে না। সবকিছু যেন গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আশরাফ আলীর আরেকটা ভয় এখন কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে একটা ভুয়া দুর্নীতির অভিযোগ এনে তদন্ত কমিটি গঠন করে দিলেই সমস্ত মিথ্যাকে সত্য বলে রিপোর্ট দাখিল হবে। ফলাও করে প্রচার হবে। মান-সম্মান যাবে। সবকিছুই এমনিতেই হবে না, করানো হবে। তার অভিজ্ঞতায় বলে, এমনই ছলে-বলে-কৌশলে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়ে কত-শত 'জজ মিয়া নাটক' যে প্রতিনিয়ত এ-দেশে মঞ্চস্থ হচ্ছে তা আশরাফ আলীর মতো সমাজ সচেতন, সুশিক্ষিত মানুষ জানে ও বোঝে। হয়তো তাদের ভাষা আজ স্তব্ধ। তারা আজ দুর্নীতিগ্রস্ত(?), কিংবা অন্য কোনো মনগড়া অভিধায় লাঞ্ছিত। আশরাফ আলী একবার অবচেতন মনে ভাবছেন, নৈতিকতা ও সুশিক্ষা তার এ-দেশে চলার পথে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে!

স্কুল কমিটির মিটিংয়ে আশরাফ আলী বুকে বল বেঁধে কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়ে যোগ দিলেন। মিটিংয়ে চারপাশে চিরচেনা সব চাটুকার– 'চাটার দল'-এর মাঝে আশরাফ আলী বসে আছেন। যারা এতদিন দূর থেকে সালাম বিনিময় করে কখনো দু-একটা কথা বলে বিদায় নিয়েছে, সামনে আসতে সাহস পায়নি, তারা আজ পাশে সমাসীন। আশরাফ আলী মনে মনে খুব অস্বস্তিতে ভুগছেন। তিনি সভাপতিসহ সকলকে মিটিংয়ে স্বাগত জানালেন। পরিচয়-পর্ব শেষে অনেক আলোচনার মধ্যে তিনি এ পর্যন্ত তাঁর করা উন্নয়নমূলক কাজের উপর সাধারণ একটা বক্তব্য রাখলেন। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা প্রসঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে স্কুলের আরো দুটো শাখা দু-জায়গায় খোলার পরিকল্পনার কথা বললেন। উপস্থিত সবাই তাঁর কাজের জন্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য ধন্যবাদ জানালো। তরফদার মুচকি হেসে আশরাফ আলীকে বাহবা দিল।

তরফদারের মুচকি কপট-হাসির তরিকা হয়তো আশরাফ আলী বুঝতে পারেননি। তরফদার স্কুলের আরো দুটো শাখা খোলার সুসংবাদকে খুবই সুনজরে দেখেছে।

মনে মনে নিশ্চয়ই ভেবেছে, 'তুমি তাই, তুমি তাই গো– আমার পরান যাহা চায়।' বাহবা না দিয়ে কি আর পারা যায়! উন্নয়ন না-দেখাতে পারলে, টাকা খরচ না-করতে পারলে টাকা উপায় হবে কোত্থেকে? টাকা আগমনের বীজ লুকিয়ে আছে টাকা খরচের মধ্যে। এ-তো রুজি-রোজগার তত্ত্বকথার অধুনাতনী সংস্করণ।

সেদিনের মিটিং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরিচয়-পর্ব শেষে সবাই হাসিমুখে বিদায় নিলো। আশরাফ আলীও মিটিং শেষে তাঁর রুমে গিয়ে বসলেন। তার মাথা থেকে দুশ্চিন্তা আপাতত কিছুটা দূর হলো। তিনি এখন কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন।

এক-সপ্তাহ পর এক সহকর্মী আশরাফ আলীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন– স্যার, আমাদের কয়েকজন শিক্ষক গোপনে সভাপতি সাহেবের অফিসে গিয়ে ঘন-ঘন দেখা করা শুরু করে দিয়েছে। একটু সাবধান থাকতে হবে; চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।

আশরাফ আলী জানেন, হিন্দু সমাজব্যবস্থা থেকে অনেক আগে বিদায় নিলেও আমাদের সমাজে 'কর্তাভজা সম্প্রদায়' নামে একটা 'উন্নত' সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছে। ভোল পাল্টিয়ে কর্তাতুষ্টি করে দেদারসে ফায়দা লোটা এদের প্রধান কাজ ও ধর্ম। মুখভর্তি আদর্শের বুলি, গুণগান। আশরাফ আলী নিজেও এদের সম্বন্ধে সচেতন। সবই সভ্য সমাজের বিবর্তন। বিবর্তনের এ-ধারায় তো আশরাফ আলীর করার কিছুই নেই।

মেঘে মেঘে অনেক বেলা বেড়েছে। বিশ দিন পর আবার স্কুল কমিটির মিটিং বসলো। আশরাফ আলী নিষ্প্রাণ বসে আছেন। তাঁর সামনেই সবাই স্কুলকে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছে। তারা শিক্ষার আলো এ অঞ্চলের সবার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায়। সেজন্য যা কিছু করা দরকার, সবকিছুই করতে প্রস্তুত। ভর্তি ফরম প্রদান এবং শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বেশ কিছু লোকের বর্তমান হেডমাস্টার সম্পর্কে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে– এ কথাটাও কেউ কেউ মিটিংয়ে জানাতে দ্বিধা করলো না। এ পরিস্থিতিতে এবারের ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে হেডমাস্টারের সম্পৃক্ততা কমিয়ে দিয়ে ভর্তি-ফরম বিতরণের সময় হেডমাস্টারের পরিবর্তে সভাপতি মহোদয়ের

স্বাক্ষর থাকার ব্যবস্থা করে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আশরাফ আলী অবনতমস্তকে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কিছুসংখ্যক অতি উৎসাহী শিক্ষকের সামনাসামনি আস্ফালন শুরু হয়ে গেল। 'পাঁঠা কোঁদে খুটোর জোরে'– এ কথাটা আশরাফ আলীও বোঝেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, তাঁর পিছনে লোক লেলিয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে।

কয়েক দিনের মধ্যে স্কুলের গেটে, মহল্লায়-মহল্লায়, 'দুর্নীতিবাজ(?) আশরাফ আলীর অপসারণ চাই' বলে পোস্টার লাগানো এবং মিছিল শুরু হয়ে গেল। মিছিলের লোক অদৃশ্য ভূতে জোগায়– টাকায় জোগায়। স্কুল কমিটি তাঁকে ডাকলো। কমিটির লোকজন অনেক ভালো ভালো কথা বললো। স্কুলের একটা সুনাম আছে, তাছাড়া আশরাফ আলীরও তো একটা সম্মান আছে, সেটা অক্ষুণ্ন রাখাটা কমিটি সমীচীন মনে করে। সসম্মানে, ভালোয় ভালোয় সরে দাঁড়ানোটা তাদের প্রত্যেকের কাছে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হচ্ছে। নইলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে তারা কেউ এটাকে সামাল দিতে পারবে না। মোটের উপর তারা সবাই আশরাফ আলীর হিতাকাঙ্ক্ষী(?), তবে জনস্বার্থের বাইরে তো তারা কেউ যেতে পারবে না, এটাই তাদের শেষ কথা।

আশরাফ আলীর মানসিক প্রস্তুতি তো আগে থেকেই ছিল। তিনি যেহেতু রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে পিছু হটতে রাজি, সুতরাং স্কুল কমিটি তাকে শিক্ষিত লোকের সম্মান রক্ষার্থে দয়াপরবশ হয়ে স্কুলে তাঁর প্রভিডেন্ড-ফান্ডসহ অন্যান্য পাওনা অচিরেই পরিশোধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিল।

আশরাফ আলী এবার বাসায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু জীবনের প্রতি, বিদ্যমান সমাজের প্রতি নিরঙ্কুশ ঘৃণা তাঁর মনে সব সময় কাজ করে চললো। ক্রমশ তাঁর স্কুলের নৈতিকতাসম্পন্ন কিছুসংখ্যক পুরোনো সহকর্মীর ঐ স্কুলে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরাও আশরাফ আলীর পথ অনুসরণ করলেন। গোপনে আশরাফ আলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন। কয়েক

দিনের মধ্যে আশরাফ আলী নিষ্প্রাণ, অনুভূতিশূন্য হয়ে ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সাধনার এই করুণ পরিণতির কথাই শুধু তাঁর ভাবতে ভালো লাগে। তিনি ভেবে পান না, কোন অপরাধে ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। হে বিধাতা, 'কত রঙ্গের পিরীতি তুমি জানো-রে বন্ধু, কত রঙ্গের পিরীতি তুমি জা-নো-ও-ও।'

কয়েক মাস পর ঐ স্কুল থেকে বের-হয়ে-আসা কিছুসংখ্যক শিক্ষক আশরাফ আলীকে খুব করে ধরলেন– স্যার, চলুন না, আবার নতুন করে শুরু করি, নতুন করে আবার একটা স্কুল গড়ি। সমাজে তো আপনার সুনাম আছে। মানুষ আপনাকে চেনে, জানে, সমীহ করে। আপনি শুধু একজন হেডমাস্টারই নন, নিজেই একটা ইনস্টিটিউট। সাধারণ মানুষ আপনাকে চায়, যদিও ঐ অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাদের নেই। চলুন যাই, শিক্ষক আজীবনই শিক্ষক।

আশরাফ আলী বিষয়টা নিয়ে ভাবেন। মন থেকে কোনো উদ্যম পান না। আবার পুরোনো সহকর্মীদের ফিরিয়েও দিতে পারেন না। অবশেষে, সহকর্মীদের আহ্বানে সাড়া না-দিয়ে থাকতে পারলেন না। স্বল্প পরিসরে কিছু সহকর্মীকে নিয়ে ভাড়া-বাড়িতে নতুন স্কুল খোলার প্রক্রিয়া শুরু হলো। আশরাফ আলীকে প্রায়ই সহকর্মীদের নিয়ে স্কুলের নানা প্রাথমিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, তবু মনে বড্ড শঙ্কা– 'আগুনে যার ঘর পুড়েছে, সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়।'

আগের স্কুল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে নিত্যনতুন খবর প্রতিনিয়ত আশরাফ আলীর কাছে আসা শুরু করলো। দুটো শাখার 'উন্নয়নমূলক কাজ' ধুমধামের সাথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নতুন হেডমাস্টার নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি সভাপতি মহোদয়ের খুবই ভক্ত, গুণমুগ্ধ, অনুগত, নিবেদিতপ্রাণ এবং শিক্ষানুরাগী(?) ব্যক্তিত্ব। কমিটির যে-কোনো সদস্য যে-কোনো প্রস্তাব নিয়ে এলে, তাকেই তিনি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। ভালো কৃরিতকর্মা লোক তিনি। 'বাও বুঝে ফেল ছ্যাপ, মানুষ বুঝে মারো খেপ।' তিনি বহমান বাতাসের গতিবিধি বোঝেন, মানুষ বুঝে খেপ মারতে পারেন।

খুব দ্রুত সরকারি অনুদান এলো। সাথে স্কুলের নিজস্ব ফান্ড ব্যবহার করাতে দুটো শাখার 'উন্নয়নমূলক কাজের' গতি বেড়ে গেল। ছয় মাসের মধ্যে কাজের অর্ধেকের বেশি সমাপ্ত। কন্ট্রাক্টর সাহেবও অতি ক্বরিতকর্মা লোক, হেডমাস্টার ও সভাপতি সাহেবের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, তাল রেখে দ্রুতলয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট সবারই আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এক বছরের মধ্যেই নতুন বিল্ডিংয়ে স্কুল কার্যক্রম শুরু হবার পথে। এখন দরকার প্রয়োজন-মোতাবেক ছাত্রছাত্রী জোগাড়, আর শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ। সে সাথে পূরণ হবে মনের লালিত বাসনা। চঞ্চলতা ফিরে এলো কমিটির সদস্যদের মধ্যে।

স্বনামধন্য স্কুল। বিজ্ঞাপন গেল, 'প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে দুটো শাখায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। মূল স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি করা হবে।' দুটো শাখায় কমবেশি চার হাজার দরখাস্ত জমা পড়লো। এ স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া কঠিন, তাই অনেক মধ্যম-মানের এবং নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিতে নারাজ। ভর্তিপরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হলো। প্রথমেই বলা হলো, 'প্রত্যেক শ্রেণিতেই সিট সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। কেবল প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটিতে পঁয়ত্রিশ জনের বেশি ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হলো না। স্কুলের ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে।'

ভর্তির কার্যক্রম শেষ হয় হয় অবস্থা। কানে কানে খবর ছড়িয়ে পড়লো, 'মহানুভব সভাপতি মহোদয়ের বদান্যতায় ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করা কিছু-কিছু ছাত্রছাত্রীকে সরাসরি ভর্তির সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এলাকার মানুষের সেবা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি শ্রেণিতে সিটসংখ্যা কিছু বাড়ানো হয়েছে। ভর্তি ফরমে সভাপতি মহোদয়ের সই ছাড়া অন্য কারো সই গৃহীত হবে না। ফরমপ্রতি আশি হাজার টাকা দিলেই চলবে।' একটু আড়ালে-আবডালে দিতে হবে মাত্র। যাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হচ্ছে তারা অতি যোগ্য এবং বিশ্বস্ত। টাকা মার যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সোনার বাংলার সোনা-দিয়ে-গড়া মানুষ। প্রথম দিন টাকাটা দিতে পারলে পরের দিনই ফরম নিয়ে যথাসময়ে হাজির। জনসেবা করতে হবে না!

বিশেষ প্রার্থীর ভর্তি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল অথচ কোনোভাবেই ভর্তি হতে পারেনি এমন সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো। তবে শেষের দিকে লেনদেনের দরকষাকষিতে রেটটা একটু কমে আশি থেকে ষাট হাজার পর্যন্ত নেমেছে। স্কুল থেকে কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তি অভিভাবকদের কাছে ফোন করতে শুরু করলো, ভর্তিচ্ছু কেউ আছে কিনা। সে সুযোগ করে দিতে পারবে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল, অথচ ভর্তি হতে পারেনি এমন ছাত্রছাত্রী পাওয়া দুষ্কর। ইতোমধ্যেই বাজারে খবর চলে এসেছে, 'জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার কারণে প্রতিটি শ্রেণিতেই সিটসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কেন আবেদন ফরম পূরণ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি, সাদা কাগজে এমন একটা কারণ দেখিয়ে নতুন দরখাস্তও বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণ করা হচ্ছে।'

মৌখিক এ বিজ্ঞাপনে ভালোই সাড়া মিললো। তবে প্রতিটি ফরমের জন্য বিনিময় মূল্য পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। আর রিসিটের মাধ্যমে ভর্তি ফি, মাসিক বেতন প্রদান– সে লেনদেন এটা থেকে আলাদা, সেটা স্কুলে গিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে।

'কামেল বাবা'র অত্যাধুনিক মানবসেবা। এ সেবায় সকলেই অভিভূত, নির্বাক। পরিশেষে, কেউ তার পোষ্যকে ভর্তির ইচ্ছা পোষণ করলেই ফরম বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হতে লাগলো। 'কামেল বাবা'র শিষ্যরা জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ। ফরম প্রতি সর্বনিম্ন দাম বিশ হাজার টাকা। অবশেষে, ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী খুঁজে পাওয়া কঠিন। 'কেউ ফেরে না খালি হাতে, খাজা রে তোর দরবারে।' 'দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে।' এভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘ দিনে সহিসালামতে সম্পন্ন হলো। স্কুলের পাশে গড়ে-ওঠা সিডির দোকান থেকে অনবরত গানের সুর ভেসে আসতে লাগলো, 'আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো।'

আশরাফ আলী দূরে বসে সবকিছুই দেখছেন, আর মনে মনে হিসাবপত্র মেলাচ্ছেন। রুজি-রোজগার আর কতই বা হবে! এই দুর্মূল্যের বাজারে তেমন বেশি কিছু না। এই ধরুন পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী, গড়ে জনপ্রতি পঞ্চাশ-ষাট

হাজার টাকা মাত্র– সর্বসাকুল্যে পঁচিশ-ত্রিশ কোটি টাকা! নিন্দুকেরা বিভিন্ন জায়গায় কানাঘুষা শুরু করে দিয়েছে, 'এ-দেশে প্রকাশ্য এ শিক্ষাবাণিজ্য দেখার কি কেউ নেই?'

চায়ের দোকানগুলোতে বিভিন্ন কুকথা বিভিন্নজন বলছে। কেউ কেউ বলছে– এ-দেশে গোয়েন্দা বিভাগ, এ-বিভাগ, সে-বিভাগ, কত বিভাগই তো আছে বলে শুনি। এসব তথ্য কি কেউ 'কর্তাবাবু'দের কানে পৌঁছায় না?

ভাববাদী এক লালনভক্ত একজনের হতাশাব্যঞ্জক কথার উত্তরে গেয়ে শুনালো– 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী-ই-ই, চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে-এ-এ...।'

এসব কথা একটু-আধটু হলেও তরফদারের কানে পৌঁছাল। তার বক্তব্য হলো– নিন্দুকেরা তো অনেক কথাই বলবে, ওরা পরাজিত শক্তির দোসর। উন্নয়নের জোয়ারে ঈর্ষান্বিত হয়ে এসব মিথ্যা অপবাদ আমার মতো সৎ, নির্ভীক ও যোগ্য লোকের বিরুদ্ধে আনছে। কারো কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে সামনে এসে হাজির করুক। এসব অপশক্তিকে নির্মূল করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মনঃকষ্ট আশরাফ আলীরই বেশি। তিনি মনের খেদে ভাবছেন, 'কুঁতে মরে হাঁস, আর ডিম খায় দারোগা বাবু।' ইতোমধ্যেই মঞ্চ সাজিয়ে বড়-বড় 'শিক্ষাগুরু', 'সাধনগুরু'দের এনে দুটো শাখাই উদ্বোধন হয়ে গেছে। সবাই গলার সুর উচ্চাঙ্গে তুলে বার বার গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন– শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষার উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। শিক্ষার বুনিয়াদ স্কুল পর্যায় থেকেই গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার সুযোগ দল-মত নির্বিশেষে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষার মান যে-কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে।

দুর্মুখেরা বলা শুরু করলো– ভালো নামকরা স্কুলে পড়ার মূল্যই আলাদা! একটু অপেক্ষার প্রয়োজন, আরো নতুন খবর আছে! খবর আছে!

আশরাফ আলীর দেখার আরো কিছু বাকি। ছাত্রছাত্রী ভর্তির পাশাপাশি জাতির বিবেক সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ অনিবার্য। প্রতিটি শাখায় কমপক্ষে সত্তরজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া জরুরি। না– শিক্ষকদেরকে নিয়ে কি আর বাণিজ্য

করা চলে(?)! মাথাপ্রতি কমপক্ষে আট লাখ টাকা, আর ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলেই হয়। কোনো অসুবিধা নেই। বেকারত্বের যুগ, নকল করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ, তাতে কী! সার্টিফিকেট তো একটা আছে। মাস্টারি করার জন্য আবার বেশি লেখাপড়া জানার দরকার হয় নাকি! বেশি লেখাপড়া-জানা লোক হলেই আশরাফ আলীর মতো জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা মারে, আর 'আধুনিক-উন্নয়নের' পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আট লাখ টাকা নগদ ঢালতে পারলে সব অযোগ্যতাই যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

স্কুল জ্ঞানপিপাসু(?) নবীন-শিক্ষকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, 'এসো, এসো আমার ঘরে এসো, আ-মা-র ঘরে ....। স্বপন দুয়ার খুলে এসো, অরুণ আলোকে, এসো মুগ্ধ এ চোখে। ক্ষণকালের আভাস হতে' কমপক্ষে ত্রিশ বছরের তরে, 'এসো আমার ঘরে'। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এমন সুযোগ্য(?) শিক্ষকদের তুলনাই হয় না। সোনার বাংলার কীর্তিমান সোনার 'কামেল বাবা'-র গোলা এ-নিয়োগকর্ম সমাধা করতে পেরে 'ধনধান্য পুষ্পভরা' হয়ে গেল। সবই গুরুর আশির্বাদ!

আশরাফ আলী তাঁর নতুন স্কুল থেকে মিটিং শেষ করে রিক্সাযোগে বাসায় যাচ্ছেন। রিক্সাওয়ালা আজ পুরোনো স্কুলের সামনের রাস্তা ধরে যাচ্ছে। আশরাফ আলী এ রাস্তা এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আজ রিক্সাওয়ালাকে এ রাস্তায় যেতে নিষেধ করেননি। মনের অজান্তেই বেশ দূর থেকেই স্কুলের দিকে নজর গেছে তাঁর। কত স্মৃতিবিজড়িত– হাতে-গড়া সেই স্কুল। প্রায় দেড়টা বছর দূরে থাকলেও প্রতিনিয়ত তা নিয়েই মনের অজান্তে তোলাপাড়া, মালা গাঁথা। চোখের সামনে স্কুলের এ ভরাডুবি, নির্মম পরিণতি তার পক্ষে সহ্য করা সত্যিই কষ্টকর। রিক্সায় বসে তাই আনমনে ভাবছেন, আর রিক্সাটা সামনে এগোচ্ছে।

স্কুলের সামনে আসতেই চোখ গেল স্কুলের সদ্য-তৈরি-করা প্রধান গেটের দিকে। দৃষ্টিটা থমকে গেল। গেটটা অনেক বড় করে তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক উত্তরাধিকারস্বত্ব-ধারার বিজ্ঞাপনে 'কামেল বাবা' অভ্যস্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বিজ্ঞাপনের জন্য প্রতিটা পোস্টার কিংবা ব্যানারের উপরের

অংশে দুই বা তিনজন দেশগুরুর ছবি থাকতেই হবে। তার নীচে স্থানীয় সাগরেদদের পদের ক্রমানুসারে একাধিক ছবি ছাপাতে হবে। এগুলো একটা নির্ধারিত অলিখিত নীতিমালা।

এ নীতিমালার মূল তত্ত্বের প্রয়োগ 'কামেল বাবা' স্কুলের প্রধান গেটে ঘটিয়েছে। গেটের দুপাশে দুটো বড়-বড় প্রশস্ত পিলার। গেটের পুরোটাই মার্বেল পাথর বসিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। এ ধরনের গেট তৈরির কথা আশরাফ আলী কোনোদিনই ভাবেননি। গেটের ডানপাশের পিলারে জাতীয় নেতার বৃহৎ একটা ছবি মার্বেল পাথরে খোদাই করে বসানো। আশরাফ আলীরও জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তবে তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয় নেতার ছবি এভাবে স্কুলের গেটে স্থায়ীভাবে বসানো কোনোমতেই শোভনীয় নয়। বরং স্কুল প্রধানের অফিস রুমে ছবি মর্যাদার সাথে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া, এভাবে যদি প্রতিটা স্কুলের গেটে-গেটে জাতীয় নেতার ছবি খোদাই করার রেওয়াজ শুরু হয়, তবে তা নেতার জন্য অসম্মানজনক। এতে তাঁর মর্যাদাকে প্রকারান্তরে ক্ষুণ্ন করা হবে। তবু 'কামেল বাবা' তা করেছে।

আশরাফ আলী নিশ্চিত যে, বামপাশের পিলারে 'কামেল বাবা'র নিজের ছবিটিও মার্বেল পাথরে খোদাই করে বসানোই তার মূল উদ্দেশ্য। সে তা করেছে। তার ছবিই-বা স্কুলের প্রধান গেটের এ পিলারে স্থায়ীভাবে কেন আসবে? এ স্কুল তৈরিতে 'কামেল বাবার' তো কোনো অবদান নেই, সে বরং ভক্ষক, জবরদখলকারী।

আশরাফ আলী বুঝতে পারছেন, এটা ক্ষণস্থায়ী আঞ্চলিক দুষ্কৃতিকারীর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'– অমর হবার অপপ্রয়াস। যে স্কুলকে আশরাফ আলী শ্রম, মেধা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে পঁয়ত্রিশটা বছর তিলে তিলে গড়েছেন, মাত্র দেড় বছরের মধ্যে 'কামেল বাবা' একে নিজের পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। অথচ আশরাফ আলী তিন যুগেও এমনটা কখনো ভাবেননি। আজব দেশের আজব নব-নব উদ্ভাবিত নীতিমালা! আজব আজব রুচির মানুষ! আশরাফ আলীর মাথাটা ঘুরছে।

এতক্ষণে স্কুল ছেড়ে বেশ দূর চলে এসেছেন তিনি। আর আধা-কিলোমিটার সামনে গেলেই বাসায় পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু মাথাটা যে বেশ ঘুরছে, বমি বমি লাগছে, বুকে বেশ ব্যথা অনুভব করছেন। তাঁর জন্য বাসায় পৌঁছানো ক্রমশই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আজ আবার কী একটা দিবস পালিত হচ্ছে। চারদিকে মাইকের বিকট আওয়াজ। কখনো উচ্চশব্দে দেশাত্মবোধক গান বাজছে। কান করে কোনো কথাই শোনা যাচ্ছে না, চিৎকার করলেও না। ব্যথাটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, আশরাফ আলী আর সহ্য করতে পারছেন না।

অনেক চেষ্টা করে কণ্ঠস্বরকে একটু বাড়িয়ে রিক্সা থামাতে বললেন। মাইকের আওয়াজে রিক্সাওয়ালা হয়তো কিছুই শুনতে পেল না। আশরাফ আলী চেতনা হারিয়ে চলন্ত রিক্সা থেকে উপুড় হয়ে রাস্তার উপর পড়ে গেলেন। পার্শ্ববর্তী লোকজন ছুটে এলো। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে টেনে উঠানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি নিস্তেজ, নাকে ও কপালে ক্ষত– দরদর করে রক্ত ঝরছে। ওদিকে মাইক থেকে সশব্দে দেশাত্মবোধক গান বেজেই চলেছে– 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা ...।'

অক্টোবর ২০১৫

ভালো আছি ভালো থেকো

আমি যে একজন মাস্টারসাহেব, সে কথা আর এখন বলছিনে। বেশি ভনিতা না করে সোজা কথা সোজাভাবে বলি। যাচ্ছিলাম নয়াবাজার থেকে স্টেশনের দিকে। পথে মতিবাবু আমাকে থামালেন।

বললেন– আরে, এ-যে মাস্টার ভাই দেখছি। কবে এলেন? অনেক দিন পর দেখা। ভালো আছি, না খারাপ আছি, খোঁজখবরও যে নেন না, যোগাযোগও করেন না। আপনাকে মনে মনে খুঁজছি। অনেক কথা আছে, আর তো পারিনে। চলুন ঘরে গিয়ে বসি।

আমি ছা-পোষা মানুষ। এই 'অনেক কথা'র সঙ্গ পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। আবার সবাইকে এড়ানোও যায় না। যারা মনের কথাটা বলে শান্তি পায়, কষ্টের কথাটা বলে হালকা হয়– তাদের কথা শুনি। নিজের কষ্টটাও মন খুলে বলি।

অনেক দিন পর বাড়ি গেছি, তাই অনেক দিন পর মতি দাদার সাথে দেখা। আমার কাছে সুখ-দুঃখের কথা না বলতে পারলে তার পেটের ভাত হজম হয় না। পেট গুড়গুড় করে। এর মাঝে জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেছে। ভোটের দিন বাইরে বেরোইনি, টিভিটা খুলে ভোটের খবরও দেখিনি। কী জানি কী ফ্যাসাদে জড়িয়ে যাই। আমি বড্ড ভীতু মানুষ, আবার মুখের দোষ প্রকট, মধুভাষী নই, অনেক বেফাঁস কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে আর কষ্ট করে ভোট দেয়া লাগে না বলে আমার এক সহকর্মী বলছিলেন। তিনি ঐ-দিন ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। মাঝপথ থেকেই কে একজন সম্মান করে সালাম দিয়ে বলেছেন– মাস্টারসাহেব, ভোটকেন্দ্রে আর যাবার দরকার নেই, ওখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। আপনার কষ্টটা অন্য কেউ করে দিয়েছেন। বাসায় ফিরে যান।

আমিও দেখি ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলাই ভালো। ফুঁ দিয়ে পথ চলে দেখি, কিছুদিন টিকতে পারি কিনা। 'লোকে বলে আছে ভালো, শালুক খেয়ে দাঁত কালো।' যাক, সেও তো ভালো।

আর নতুন-নতুন টেকনোলজি, টেকনিক্যাল বুদ্ধি, ওসবের সাথে আমি অভ্যস্ত নই। যুগ এখন পাল্টে গেছে। পুরোনো কথা, সেকেলে বুদ্ধি এখন সব বস্তাপচা, নঞর্থক, অচল মাল। কত আধুনিক বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, নতুন নতুন ফন্দিফিকির, বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, প্যাঁচের কথা– সবই এখন হালে পানি পাচ্ছে। সব কিছু দেখেও না-দেখা, না-বোঝার ভান করতে হয়। আত্মপ্রবঞ্চনা আর কী! পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো। একে তো মাস্টারমানুষ, তাতে আবার ট্রেডিশনাল মডেল। নতুন জোয়ারে নতুন সুবুদ্ধিওয়ালাদের(?) জায়গা ছেড়ে দেয়া ভালো। চলতে দেয়া ভালো। আমারই বেশ কিছু সহকর্মীকে দেখলাম, পোশাক পরিবর্তন করতে– বিভিন্ন মঞ্চে অনুকূল বাতাস বুঝে কথা বলে, কখনো পত্রিকায় লিখে, বিবৃতিতে সই দিয়ে 'সাধনগুরুর' সুদৃষ্টি কাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে, সুনজরে আসতে, বড় পদ বাগিয়ে নিতে। সবই গুরুর সন্তুষ্টি, তার সন্তুষ্টি মানেই তার সম্পত্তিতে অধিকার, ক্ষমতা জাহির, সমাজে সম্মানের সাথে চলাফেরা। আমি নিজেকে দূরে দূরে রাখি। কী জানি কোন ভেজালে পড়ে শেষে জীবনটা খোয়াবো, ছেলে-মেয়ে এতিম হবে। বউ বিধবা হবে। লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শেষে ছেলে-মেয়ের জন্য কবর জিয়ারতটাও বন্ধ হয়ে যাবে। গায়েব, বিলকুল গায়েব। এসব অনেক কথা মনে মনে ভাবছি, আর মতিদাদার সাথে তার বাসার দিকে এগোচ্ছি।

বাসার গেটে যেতে না যেতেই মতিদাদা বেশ উচ্চস্বরে বলে উঠলেন– কইগো, দেখো, এদিকে এসো। দেখো, কাকে নিয়ে এসেছি! মাস্টার ভাই এসেছেন।

বৌদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে নমস্কার জানালেন। বললেন– এতদিনে বৌদির কথা মনে পড়লো, দাদা। বসুন, বসুন।

তারপর গলার স্বরটাকে উদারা স্বরে ফিরিয়ে এনে বললেন– ছেলে-মেয়ে নিয়ে আর তো টিকতে পারিনে দাদা, বড় বিপদে আছি। আপনার দাদার সাথে কথা বলুন, আমি রান্নাঘরে যাই।

মতিদাদা আমাকে বসালেন, নিজে পাশে বসলেন, তারপর সুখ-দুঃখের কথা শুরু করলেন। বড় ছেলেটাকে বিয়ে দিতে চান, মেয়ে খুঁজছেন, তবে মনমতো মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। মোবাইল ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহারে কোনো মেয়ের প্রতি ভরসা রাখা কঠিন। তেমন মেয়ে মেলানোও অনেক কঠিন। নিজেদের পরিচিতজনের মধ্যে হলে ভালো হয়, তাও পাওয়া যাচ্ছে না।

মেজো-মেয়েটাকে নিয়ে আরো অসুবিধা। কলেজে যাওয়া-আসা বেশ দায়। বখাটেদের উৎপাতে পুরো শহরটাই অতিষ্ঠ। সব উচ্ছন্নে-যাওয়া বখাটেরাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ে চলাফেরা করে। আগে সমাজে এমনটা ছিল না। তখন বখাটেদের চেনা যেত। বর্তমানে বখাটে এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মী পৃথক করা কঠিন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সবকিছু একাকার হয়ে গেছে। এরা আবার মাদকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে এরা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করছে। তাদের কেউ একটা ফোন ঠুকে দিতে পারলেই সাথে সাথে বিশ-পঞ্চাশ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হাজির হয়। পুরো অবস্থাটাই 'অন্ধকার-যুগ'কেও হার মানিয়েছে। মানুষের মন থেকে দয়ামায়া চলে গেছে। ভুক্তভোগী ছাড়া এসব কেউ বোঝে না। আমাদের সমাজে এসব ভেবে দেখার লোকেরও বড্ড অভাব দেখা দিয়েছে। যারা এটা নিয়ে ভাবছে, কোটরের প্যাঁচার মতো কোটরে বসেই ভাবছে, বাইরে বেরোতে পারছে না। বলতে গেলেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক রং তাকে মাখিয়ে একাকার করে ফেলা হচ্ছে। যে কোনো সাধারণ ভালো-মন্দকেও রাজনৈতিক রঙে রাঙানো হচ্ছে। সবকিছুতেই রাজনীতি আর রাজনীতি। রাজনীতির জোয়ারে সমাজের দুকূল প্লাবিত। সমাজে 'রাজনীতি' শব্দটা নঞর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘরে ঘরে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জীবনযাত্রা সয়লাব, পেটের ধান্ধায় রাজনীতি। 'প্রজানীতি'র দিন এখন শেষ। সবাই সক্রিয় রাজনীতিবিদ।

আমি মাঝখান থেকে ফোঁড়ন কেটে বললাম– বর্তমানে আবার রাজনৈতিক কর্মী কোথায় পেলেন? আমার চোখে তো কোনো 'কর্মী' ধরা পড়ে না। আমরা সবাই নেতা। দেখে সবাইকেই তো নেতা নেতা মনে হয়।

আসলে আমি কিন্তু সে চোখেই দেখি। গ্রাম থেকে থানা পর্যায়ে যারা ঘোরাঘুরি করে, রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত– ওদের নাম দিয়েছি 'মহান নেতা'। জেলা পর্যায়ের নেতাগুলোকে নাম দিয়েছি 'অতিমহান নেতা'। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতাগুলোকে বলি 'চিরমহান নেতা'। ওদের কর্মকাণ্ড দেখলে ও ভাষা শুনলে দুচোখওয়ালা কোনো ব্যক্তির পক্ষে ওদের প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখা কঠিন। দু-চারজন যে চরিত্রবান নেতা নেই, তা নয়, তবে দলে তাদের কোনো মূল্যায়নই নেই। তাদের নীতি ও আদর্শ-কথায় দল চলে না। তাদের কাছে ছোট 'মহান নেতা'রা পর্যন্ত যায় না– পাত্তা দেয় না। দলের মধ্যেও তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। তাদের অবস্থাটা 'মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন এক মহান-ব্যক্তিত্ব' ছাড়া আর কিছুই না। তাদের সংখ্যাও ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' আর কি!

আমি পকেট থেকে দুটো রুমাল বের করে দাদাকে দেখালাম, আর বললাম– দেখুন দাদা, আমি কিন্তু সব সময় পকেটে দুটো রুমাল রাখি। একটা নাক-মুখ মোছার কাজে, অন্যটা ঘৃণা নিবারণের কাজে। যা করি, তা মনে মনে করি। প্রতীকী ঘৃণা প্রকাশ করি। ওই প্রতারক সম্প্রদায় সামনে দেখলেই রুমাল বের করে নাকে ধরি। সমাজের একজন নগণ্য মাস্টারসাহেব হিসেবে দুর্গন্ধযুক্ত কিছু দেখলে সবার অজান্তে এ প্রতীকী কাজটুকু বিবেকের তাগিদে আমাকে করে যেতে হচ্ছে। কোনো দলের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করা, আর নেতা-নেত্রীদের জঘন্য কর্মকাণ্ড, উদগ্র দালালগিরি, বেহায়াপনা ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আস্থা রাখা, শ্রদ্ধা করা এক কথা নয়। এছাড়া, সমাজে এখনো অসংখ্য চরিত্রবান এবং যোগ্য লোক আছে। কিন্তু বিদ্যমান অবিমৃষ্য সমাজের মিথ্যা ও চরিত্রহনন প্রক্রিয়ার প্রবল দাপটে তারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে মুখ লুকিয়ে নিভৃতে জীবনযাপন করছে।

দাদা বললেন– টিকে থাকা বড্ড কঠিন। ছোটখাটো একটা ব্যবসা করে চলি। কী আর বলি দাদা– শুধু চাঁদা আর চাঁদা! চাঁদার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। সব সময়ই যে নগদ টাকা চাঁদা দিতে হয়– তা নয়; বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন প্রকারে, রং-বেরঙের চাঁদা। জীবন রাখা দায়। পুলিশকে জানিয়েও কাজ হয় না। তারাই-বা কতটুকু আর করতে পারে– ঠগ বাছতে গেলে যে গাঁ উজাড় হবে। তাছাড়া কেন

জানি চাঁদাবাজরা সব খোঁজ পেয়ে যায়। ওদের মাথায় জট আছে। ওরা সব জটাধারী সন্ন্যাসী। জট নাড়ে, আর অবলীলায় সব জেনে ফেলে। তাই পুলিশকে জানানো মানেই জীবনটা হাতে করে খোয়ানো আর কি! বর্তমান সমাজে চাঁদাবাজ, অস্ত্রবাজ, সন্ত্রাসী এবং ক্ষমতাপন্ন নেতা সমার্থক শব্দ।

– হ্যাঁ, এবার অভিধানের সাম্প্রতিক সংস্করণ বেরোলে এগুলো সেভাবেই প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি। কারণ বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই তো অভিধান সংস্করণের কাজ করেন বলে জানি। আমি একটু ক্ষোভমিশ্রিত রসিকতা করে বললাম।

উনি এবার ধীরে-স্বচ্ছন্দে বলে চললেন– আমার বাড়ির পাশেই তো এক 'অতিমহান নেতা'র বসবাস, তা তো আপনি জানেন। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে তার ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমার কাছে বেচে খেয়েছিল। তখন সে ছিল এক উড়নচণ্ডে সোশ্যাল-টাউট। কুসঙ্গে পড়ে খারাপ নেশায় মাতোয়ারা ছিল। দিনে দিনে সব ফুঁকে দিয়েছিল। বর্তমানে সে হয়েছে 'অতিমহান নেতা', এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ত্রাতা। তার সাথে যোগ দিয়েছে তার যত আত্মীয়-স্বজন এবং পুরো অঞ্চলের দলীয়-টাউট। সমাজটাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে, এ অঞ্চলের রক্তচোষা সম্প্রদায়ের প্রধান। কেউ টুঁ-শব্দটাও করতে পারছে না। কথা বললেই জীবন খতম। জীবনের মায়া কার না আছে!

বললাম– দূরে থাকলেও অনেকের মাধ্যমে খোঁজখবর ভালোই রাখি। কিন্তু 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, আমার বলার কিছু ছিল না' অবস্থা। শুনলাম, তার কাছে নাকি এ অঞ্চলের আড়াইশ সমিতির ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীর নামের তালিকা আছে। এই যেমন ইটভাটা মালিক সমিতি, কন্ট্রাক্টর সমিতি, পোল্ট্রি-ফার্ম মালিক সমিতি, পরিবহণ মালিক সমিতি, নেশা-বিক্রেতা কল্যাণ সমিতি, উত্তরপাড়া দোকান মালিক সমিতি, নিকাহনামা রেজিস্ট্রেশন সমিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেকের কাছ থেকে নাকি নিয়মমাফিক লাখ-লাখ টাকা মাসোহারা আদায় হয়। এ-ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও কাউকে কাউকে নাকি ডেকে পাঠায়। এই যেমন ধরুন, একজন কন্ট্রাক্টরকে বললো, 'এই, তুই তাড়াতাড়ি এসে একটু দেখা করিস, তোকে একটা কাজ দেব।' এতে কন্ট্রাক্টরও বোঝে যে, দু-এক লাখ টাকা হাতে করে দেখা করতে যেতে বলছে। বাকি লেনদেন পরে হবে। এমন করে নাকি অনেকেই

উড়ে-বেড়ানো টাকা ভাগাভাগি করে টাকার পাহাড় গড়ছে। শুনলাম, একসময় যে গ্রামে গ্রামে গাছের গুঁড়ি কিনে-বেচে খেতো সেও এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে শত-কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে! শুধু বাতাস বুঝে, ভোল পাল্টিয়ে চলার 'যোগ্যতা' দরকার। আর 'নৈতিকতা' নামের পুরোনো শব্দটাকে মনের অভিধান থেকে চিরবিদায় দিয়ে একবার কবরস্থ করতে পারলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়– ব্যস, কেল্লা ফতে; সবগুণে গুণান্বিত, আলাদীনের চেরাগ হাতে। পরিবেশ-পারিপার্শিকতা যথেষ্ট অনুকূলে। কোথাও কোনো বাধা নেই!

– আচ্ছা, আপনার ভাষায় 'চিরমহান নেতারা' কি এসবের খোঁজখবর রাখে না? দাদার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

বললাম– তারাও যার যার ধান্ধায় রাতদিন ব্যস্ত। কে কাকে বলবে? 'হামভি কাঁঠাল খায়া, তুমভি কাঁঠাল খায়া, তুম হামারা দোস্ত' অবস্থা। জেগে ঘুমানো লোকদের জাগানো কঠিন। রবি ঠাকুরের সেই পুরোনো তত্ত্ব এখন খুবই ব্যাপকভাবে সমাদৃত, 'দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে'।

ওর এক আত্মীয়, ছোট্ট একটা বাজারে রাস্তার ধারে বসে বস্তা বেচে দিনাতিপাত করতো। সেও আজ কোটিপতি, বর্তমানে সেও 'মহান নেতার' তালিকায় নাম লিখিয়েছে। দাদা তার মনের সমস্ত ক্ষোভ যেন আমার কাছে বলতে পারলেই একটু শান্তি পান।

দাদা আরও বললেন– আপনি জানেন, আমার বাবাও ব্যবসা করতেন, আমিও তো ঐ ব্যবসা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। আমি তো কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক ঝামেলায় যাইনে। এখন দেখছি জীবনটা কাটানোই খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বললাম– শুনুন দাদা, প্রত্যেকটা লোকেরই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি নৈতিক সমর্থন থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সমর্থনকে ফন্দিফিকির করে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে কৌশলে নিজস্বার্থে ব্যবহার করা সাম্প্রতিক সময়ের এক ধরনের লাভজনক রাজনৈতিক-ব্যবসা। এটা সুবিধাভোগী বাঙালি লুটেরা-শ্রেণির অভিনব এক আবিষ্কার। এ এক রাজনৈতিক নৈরাজ্য।

মনে হচ্ছে ভিতরে মতিদাদার আরো কিছু কথা আছে। এখনো সবটুকু বলা হয়নি। এতক্ষণে বৌদি নাস্তা ও চা-র ট্রে হাতে নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হলেন। বসতে বসতে বললেন– আমি বলি কি দাদা, বড় ছেলেটার বিয়েটা কিছুদিন পরে দেয়া যাক। মেজো-মেয়েটার বিয়েটা আগে আগে দিয়ে ফেলি। কখন যে কী ঘটে যায়, বলা মুশকিল! কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে মেয়েটা এখন বিয়ে করতে চাচ্ছে না। সে একটা ছেলেকে পছন্দ করে। রাত-দিন তার সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ। ছেলেটা বর্তমানে বেকার। টাকা-পয়সা জোগাড় চলছে, দিতে পারলেই একটা চাকরি হয়ে যাবে, বলেছে। তারপর বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। আমি বলি কী, আপনার দাদা কিছু টাকা এখন ছেলেটাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরিটা পাইয়ে দিক। তাহলেই মেয়েটার বিয়েটা হয়ে যায়। আশপাশের পরিবেশ খুব খারাপ। আমার তো খুব ভয় করে। কথায় কথায় রামদা, চাইনিজ কুড়াল, কিরিচ হাতে করে ঘুরছে। মারছে মরছে। পেপার-পত্রিকায়ও এমন ঘটনা অহরহ দেখছি।

বললাম– আপনারা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, প্রতিটা বিষয় নিয়ে মারামরি হচ্ছে, মরছে। সমাজে সহনশীলতার বড় অভাব। বিপক্ষীয় দলের সাথে মারামারি করেও মরছে, আবার অভ্যন্তরীণ কোন্দলেও মরছে। মুরগির ডিম নিয়ে মারামরি করে মরছে, আবার মুরগি নিয়েও মারামারি করে মরছে। স্বার্থ কতটুকু এটা বিবেচনার শক্তি ওরা হারিয়ে ফেলেছে। জমি নিয়ে মারামরি করে মরছে, আধিপত্য নিয়েও মরছে। চাঁদা ভাগাভাগি নিয়েও মরছে, নেশা ভাগাভাগি নিয়েও মরছে।

আঠারো হাজার সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে তার বিবেক ও মনুষ্যত্বের কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। সেই মনুষ্যত্ব এবং বিবেচনাশক্তি মানুষ হারিয়ে ফেললে অন্যান্য ইতর প্রাণীর তুলনায়ও অধম হয়ে যায়। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তার অনেক খোরাক রয়ে গেছে। কোথাও আইনের কোনো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ নেই। সন্ত্রাসী চিহ্নিতকরণেই ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা হচ্ছে। এ নিয়েই আমাদের নিত্যদিনের বসবাস। আমরা একটা সন্ত্রাসী জাতিতে পরিণত হচ্ছি। যদিও এসবের সঙ্গে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের কোনো সংশ্রব নেই।

বৌদি যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। দাদা বৌদিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– তুমি তোমার এসব কথা এখন রাখ। আমি আমাদের ঐ কথাটা বলার জন্য দাদাকে নিয়ে এসেছি। দাদার কাছে পরামর্শ নেব।

বৌদি বললেন– তো বলো।

মতিদাদা একটু নড়েচড়ে বসে বললেন– বলছিলাম কি দাদা, বড্ড অসুবিধায় পড়ে গেছি। বিপদের রাত নাকি সহসা পার হয় না। একে তো চাঁদার অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তারপর আবার গত সপ্তায় ঐ 'অতিমহান নেতা' আমার বড় ছেলেটাকে ডেকেছিল। এটা-ওটা অনেক কথা প্রথমে বলেছে। তারপর শেষে বলেছে, 'এই, তোদেরকে তো আমার সবকিছুই দিয়েছি। ত্রিশ বছর আগে আমি তো আমার সব তোদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলাম। এতদিন ধরে তো তোরাই তার কামাই খাচ্ছিস। তা তোর বাপকে বলিস, এখন একটা ভালো দিন দেখে যেন আমার ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দলিলটা আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে যায়। আমি তো তোদেরকে বরাবরই ভালো জানি। অবশ্যই তোর বাবাকে বলবি এবং কাজটা করবি। এ-নিয়ে যেন আর কথা বাড়াসনে।' আমি তো এখন মহাসংকটে পড়ে গেছি, দাদা। ও যে-মানুষ, ওর মস্তান বাহিনী দিয়ে আমাকে শেষ করে ফেলবে। পত্রিকা খুললেই এমন ঘটনা তো প্রায়শই চোখে পড়ছে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। কী করি, আপনি একটা সুপরামর্শ দিন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটা ওর নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে আমরা খাব কী? কোথায় যাব?

বললাম– একটু সময় নিন, ভেবেচিন্তে কাজ করুন। হাত যেহেতু ও আপনার দিকে একবার বাড়িয়েছে, আমার মনে হয় না যে খালি হাত ফেরত নেবে। কথায় আছে না, 'বাঘে ছুঁলে এক-ঘা, পুলিশে ছুঁলে আঠারো-ঘা,' আর পলিটিক্যাল টাউটে ছুঁলে বাহাত্তর-ঘা। সে অন্যায় করুক, আর ন্যায় করুক– এটা তার দল দেখবে না, ওর দলের সবাই ওর ভাষায় কথা বলবে, 'সব শিয়ালের এক রা'। প্রশাসন ওকেই চিনবে, আইনও ওরই পক্ষে যাবে। প্রয়োজনে ও আপনার নামে একটা মিথ্যে মামলা ঠুকে দেবে। দেশটাই ওর, ওদের। বর্তমানে প্রত্যেকটা দলই কোটারি স্বার্থ ও ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে বহুধাবিভক্ত। আপনি বরং ওই একই

রাজনৈতিক দল করে, অথচ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, এমন কারো আশ্রয় নিতে পারেন কি-না দেখুন।

মতিদাদা বললেন– আমার বয়স তো শেষ, যখন-তখন চলে যেতে পারি। আমাকে নিয়ে আর ভাবিনে। সমস্ত ভাবনা ঐ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। আমার অবর্তমানে ওরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমি তো না-হয় মরে বাঁচবো। ইচ্ছে করলে অন্য দেশে চলে যেতে পারতাম। সেকেন্ড হোম করার প্রস্তাবও আমার এসেছিল কিন্তু তা করিনি। জন্মেছি এখানে, ছোট থেকে বড় হয়েছি এখানে, বাপ-দাদার ভিটে এখানে; কত মায়া! কত স্মৃতি! অন্য কোথাও যাব কেন? দেশান্তরী হবো কেন? ছেলে-মেয়েকে আমি কোথায় রেখে মরবো, এটাই বড় চিন্তা। ওদেরকে কোন নরকে রেখে যাচ্ছি, এটাই আমার বড় ভাবনা। আমি তো মরেও শান্তি পাব না।

বললাম– দাদা, আপনি তো জানেন, কত বেশে, কত দেশে জীবনভর ঘুরেছি। ইচ্ছে করলে থেকে যেতে পারতাম। জানিনে কিসের টানে বার বার ফিরে আসি। পরিচিত সমাজ, আপনজন, এ মাটি আমাকে টানে। আবার এই শেষ বয়সে যাব কোথায়? মূলছিন্ন হতে যে মন চায় না! কিন্তু এ-দেশটা যে ক্রমশই বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে! একটু ধৈর্য ধরুন, দেখুন কী হয়।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম– দাদা, আপনি যে আগে খুব সুন্দর তবলা বাজাতেন, এখন কি আর বাজাতে ইচ্ছে করে? টেবিলে হাত রেখে দ্রুতলয়ে তাল দিয়ে ঐ দুখজাগানিয়া গানটা একটু গান তো, শুনি– 'হায়রে তোমার পিরিতের এত জ্বালা-রে বন্ধু, আগে তো না-জানি-ই-ই।'

দাদা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– এই আমার প্রিয় মাতৃভূমি, বড় শখের জন্মভূমি! সাধারণ মানুষের জন্য এটা যে বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ড্রইংরুমের সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতেই আমার দৃষ্টিটা দাদা-বৌদির শোবার ঘরে গেল। কোনো এক কবির লেখা সেই অতি পরিচিত শব্দগুলো, সাদা কাপড়ের উপরে বৌদির সুনিপুণ হাতে রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই করে লেখা।

লেখাটা কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙানো। শব্দগুলো পুরোনো হলেও ওর আবেদন আজ আমার কাছে নতুন করে প্রতিভাত হচ্ছে। লেখা আছে, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আমি অনলে পুড়িয়া গেল।'

মতিদাদার ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা বড় রাস্তায় এলাম। চারপাশ তাকিয়ে নিলাম। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিয়মমাফিক চলছে। মানুষগুলো সাদা-রঙিন জামা-কাপড় পরে যার যার পথে চলছে। রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাচ্ছে– দোকানি চালাচ্ছে দোকান। দৈনন্দিন জীবনের কোথাও কোনো ব্যত্যয় নেই। আমিও স্বাভাবিক। চৌমাথার স্টেজ থেকে ঐ অতিমহান নেতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর মাইকে ভেসে আসছে, 'অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সোনার বাংলা গড়ার কাজে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দেশের উন্নয়ন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'

আমি যে-স্টেশনের দিকে যেতে চাচ্ছিলাম, সেদিকেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম। স্টেশনে পৌঁছানোর আগে এক বুড়ো ক্ষৌরকারের ছোট্ট দোকান থেকে অতি পরিচিত পুরোনো দিনের ব্যথাজাগানিয়া গান ভেসে আসছে। জানিনে, সে-ই-বা কোন দুঃখে এ গান বাজিয়ে চলেছে। তার মনের কষ্টটা জানতে পেলে আমার হয়তো ভালো লাগতো। অবচেতন মনে প্রশ্ন এলো, তাহলে কি ঐ গরিব ক্ষৌরকারের জীবনকেও ঐ পরজীবী-রাজনৈতিক পোষ্যপুত্ররা চাঁদার জন্য প্রতিনিয়ত অতিষ্ঠ করে তুলেছে ? গানের প্রথমাংশটা হয়ে গেছে। তবু আমার সুরসন্ধানী কান ওদিকেই খাড়া হয়ে আছে। গান বেজে চলেছে, '...ও নাইয়া রে, পরানে আর সইব কত আগুন জ্বলে মনে, বনের আগুন দেখতে পারে, মনের আগুন পুইড়া মারে, ধিকিধিকি জ্বইলা, কোন দূরে যাও চইলা ...।' আমি কাছে চলে এলেও স্টেশনে পৌঁছানোর অনিশ্চয়তায় তখনও ভুগছি।

মার্চ ২০১৬

মহাতাব সমাচার

শিক্ষকদের একটা মহৎ দোষ আছে– বেশি বেশি কথা বলা, কিংবা একবার কথা শুরু করলে আর থামতে না-চাওয়া। কেউ কেউ এমনও বলেন– 'না, দোষটা অন্য। সামনে যাকেই পান, যার সাথেই কথা বলেন, তাকে ছাত্রের মতো মনে করেন। বয়স যতই বাড়ে, প্রবণতাটা ততই বাড়তে থাকে।' আমি কিন্তু তা করলাম না।

মহাতাবের সাথে আমার অনেক আলাপচারিতাই হলো। অনেকভাবেই তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। চেষ্টা করলাম, তার কথা বেশি করে শুনতে, তাকে বুঝতে– তার কথার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা, তত্ত্বকথা আছে কিনা তা খুঁজতে।

চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলাম– কর্মক্লান্ত মুখশ্রী। চেহারায় কমনীয়তা বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। চোয়াল ভাঙা, লম্বাটে মুখ। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি। হালকা শরীর-স্বাস্থ্য। বয়স কমবেশি পঁয়ত্রিশ। মাথায় বেশ চুল। মনে হলো অনেক দিনই সেলুনে যায়নি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শরীরের পরিচর্যা করলে চেহারাটাকে একেবারে খারাপ বলা যেত না। নেশা-টেশা করে কিনা জিজ্ঞেস করাটা উচিত নয়, আর জিজ্ঞেস করলে স্বীকারও করবে না, এটা বুঝি। চেহারা দেখে অনেকটা আঁচ করা যায়, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা হচ্ছে। ফলে ঐ আবছা আলোয় অতটা ভালো করে দেখে মতামত দেয়াটা কঠিন।

মোবাইল ফোনের যুগ। বিয়েটা আগেই মন দেয়া-নেয়া করে হয়েছিল– না সেটেলড-ম্যারেজ, তাও জিজ্ঞেস করিনি। তবে কথায় কথায় বুঝলাম, বাসায় নিকটতম, একেবারে কাছের একজন মহিলা আছে, যাকে সব কথাই সে বলে।

আমার সাথে কথা বলতে বলতেই একবার ফোন এলো। বুঝলাম, বাসা থেকে কাছের সেই মহিলাই ফোন করেছে। আমার সামনেই বলতে শুনলাম, বাসায় ফিরতে বেশ রাত হবে। কারণ সে এখনও জানে না, কীভাবে বাসায় ফিরবে। বাসা তেরো-চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে। মিরপুর বারো নম্বর পর্যন্ত প্রথমত যেতে হবে, তারপর আশপাশ কোথাও বাসা। কীভাবে যাবে তাও তার এখনও অজানা। এখনও সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে একটু পুব-দিকে এলে যে দোয়েল-চত্বর, তার পাশে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের কাছে বসে আছে। রাস্তার উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে ফুটপাথের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে আর আমার সাথে কথা বলছে।

গিয়েছিল গুলিস্তানের পাশে বিরোধীদলের একটা জনসভায়। সে এসব জনসভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকে। যে সরকারই যখন থাকুক না কেন, বিরোধীদলের জনসভায় সে থাকে। আসার সময় তার এলাকার সম্মানীয় এক 'মহান নেতা' তার মতো এমন অনেক লোককে একটা লোকাল বাসে করে নিয়ে এসেছিল। বিপত্তি ঘটেছে অন্য জায়গায়। জনসভার শেষের দিকে বিপক্ষ দল হঠাৎ আক্রমণ করায় এবং পুলিশের ইতস্তত লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছাড়াতে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেছে। যে-যেদিকে পেরেছে ছুটেছে। এছাড়া কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে জনসভা ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার পর যে-যেখানে পেরেছে যানবাহন ভাঙচুর করেছে। যানবাহনগুলোও তাদের জীবন নিয়ে ড্রাইভারের সহায়তায় যে-যেদিকে পেরেছে ছুটেছে। যানবাহন ভাঙচুর বিরোধীদল করেছে, নাকি রিপোর্টারদের গায়ে-না-মাখা ভাষায় 'কে বা কাহারা' করেছে, বলা দুষ্কর।

এ নিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ চলতে থাকবে এবং কার কার নামে কোথায় মামলা দিতে হবে এটা সংশ্লিষ্ট মহল আগে থেকেই বিলকুল ওয়াকিবহাল। তবে যে মিডিয়া যে দলের পক্ষে, তারা সেটাকেই ফলাও করে বাঁকাভাবে আজ রাত থেকেই প্রচার শুরু করে দেবে। আবার কোনো কোনো মিডিয়া এড়িয়ে যাবে। দৈনিক পত্রিকাগুলোও দিনে দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর একনিষ্ঠ শিষ্যত্ববরণ করেছে। কোনো খবরের উপর সাধারণ মানুষের ভরসা করা কঠিন। কথার শেষে একটু নোক্তা যোগ করে দিলেই উদ্দেশ্য হাসিল, আর এটা তো সাধারণ

ব্যাপার। প্রতিটা সাধারণ বাঙালিই এগুলো বুঝতে বুঝতে এখন বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। কোনটা সঠিক, আর কোনটা বেঠিক এত যাচাই করার, বা তা-নিয়ে তর্ক করার কীই-বা আছে! নিজের চোখ এবং কান ছাড়া বিশ্বাস করা কঠিন। মোদ্দা কথা হলো, মিডিয়ার পাল্লা যেদিকে ভারী, সত্য হোক, মিথ্যা হোক– প্রচারের পাল্লাও সেদিকে ভারী। সত্যমিথ্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ এখানে নিতান্তই অবাস্তব। আজকাল রাজনীতি তো আর শুধু রাজনৈতিক দল ও নেতা দিয়ে হয় না, হয় দলীয় মিডিয়া দিয়ে। ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিয়ে, প্রচার দিয়ে। জলজ্যান্ত পুরুষকেও মহিলা বানিয়ে ছাড়ে।

দেখলাম এসব মহাতাব ভালোই বোঝে। ভাড়ায় খাটলে কী হবে, অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি তার আছে। রাজনৈতিক কথাবার্তায় সে চৌকস। বক্তৃতা শুনে শুনে এই অবস্থা। স্বাধীনতার সুফল মহাতাবের ঘরে পৌঁছায়নি, তার ভাগ্য বদলাতে পারেনি। কিন্তু রাজনীতির-ব্যবসায় ভালো পসার জমেছে। আর রুজি-রোজগার ভালোই হচ্ছে। তাও সে বোঝে। আমি ভাবলাম, স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের নেতা-নেত্রীরা এ-দেশের জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি; বরং জন-আপদে পরিণত করতে পেরেছে এবং সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, এ কৃতিত্বই-বা কম কি? তা-কি মহাতাব বোঝে?

মহাতাব বলতে চায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'আমরা' এবং 'ওরা' শব্দ দুটো ছিল। এখন তো আর 'ওরা' শব্দটা নেই, সবই তো আমরা, তবে আর বাছবিচার করে কী হবে, তাই সে সব দলের হয়েই জনসভায় আসে। যে যখন ডাক দেয়, তার ডাকেই সে সাড়া দেয়। মিটিং-মিছিলে আসে। প্রয়োজনে গাড়ি ভাঙচুর শুধু কেন, গাড়িতে আগুন দেয়। এটা তার শখ, অভ্যাসও বলা চলে। তবে বিশেষ নির্দেশনা থাকলে সেটা আলাদা কথা। আজ গাড়িতে রাগের বশবর্তী হয়ে কয়েকটা ইটও মেরেছে। মহাতাবের আত্মপ্রসাদ হচ্ছে, সে যে ক বছর ধরেই গাড়ি ভাঙচুর, কিংবা গাড়িতে আগুন দিচ্ছে, তার আগুনে কোনো লোক মারা যায়নি। এদিকটা সে সবসময় বিবেচনায় রাখে।

মনে হলো, বাহ! সুন্দর আত্মতৃপ্তি বটে। মনে পড়ে গেল ছোটবেলার স্মৃতি। আমার সামনে এক কুখ্যাত ডাকাত বলেছিল, 'আমি যত খারাপ কাজই করি না

কেন, আমাকে যদি একবার জ্ঞাতসারে, অথবা অজান্তে এক চিমটিও লবণ কেউ খাওয়াতে পারে, তবে আমি তার সাথে আর নেমকহারামি করিনে, আমারও একটা ধর্ম আছে।' মহাতাব তো দেখলাম, রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচ অনেক বোঝে। আমার ধারণা হলো, এই মহাতাব যদি তার 'মহান নেতা', 'অতিমহান নেতা' কিংবা 'চিরমহান নেতা'দের এভাবে প্রশ্ন করতে থাকে, তাদের প্রতিজনই বলবে যে, 'না– যত-যাই করি না কেন, আমারো একটা ধর্ম আছে, আমার এবং আমার বংশধরদের সম্পদ ও বসতবাটি যতই বিদেশে থাক না কেন, বিদেশের গোলামি করি না কেন, আমি যেখানেই মরি না কেন, আমার লাশটা অন্তত এ-দেশের মাটিতেই কবর দিতে বলবো, আমি কখনো আমার মা-মাটির সাথে নিমকহারামি করিনে।' আত্মতৃপ্তি বটে! 'ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল।'

নেতা-নেত্রী সম্বন্ধে মহাতাবের ধারণা বেশ স্বচ্ছ। যে-দল যখনই ক্ষমতায় থাক না কেন, সবাই 'ত্যাগী' নেতাদের মূল্যায়নের কথা বলে। এখানে 'ত্যাগী' মানে বিরোধী দলে থাকাকালে যে যত জেল-জুলুম সহ্য করেছে, আহত হয়েছে, অত্যাচারিত-নিগৃহীত হয়েছে, সে। 'ত্যাগী' অর্থ এখানে অভিধান থেকে খুঁজে বের করলে চলবে না। 'ত্যাগ' মানে এখানে দলীয় আদর্শে 'ত্যাগী', কিংবা আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে জনগণের স্বার্থে কাজ করাকেও বোঝাবে না। 'ত্যাগী' শব্দটা এখানে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। দলে পদ-পাওয়ার অর্থও ঐ 'ত্যাগ' এবং বাগাড়ম্বরতা–সন্ত্রাসী প্রতিপালন। 'মহাগুরুর পদলেহন' নামে আরেকটা শব্দ অভিধানে আছে–সেটারও এ সমাজে যথেষ্ট কদর আছে। এসব সমীকরণ দেখলাম মহাতাব ভালোই বুঝেছে এবং বুঝটা বাস্তবের সঙ্গে মিলাতে পেরেছে। এসব বিবেচনায় তারা কোনোদিনই দেশের সার্বিক উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করতে পারবে না এবং ভবিষ্যতে যে-দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, কোনো পদও পাবে না। তাই মহাতাব ব্যক্তি উন্নয়নে বিশ্বাসী। এটা নিশ্চিত হয়েই যখন সময়-সুযোগ পায় সে জনসভায় ভাড়াতে আসে। সুবিধার মধ্যে দুপুরে বিরানির প্যাকেট একটা, আর নগদে পাঁচশ টাকা। তাছাড়া বিশেষ কাজের বিশেষ পারিশ্রমিক। এ উপায়টুকুই-বা কম কী? 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক; দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।' মহাতাবের মত হলো, ঐ-সব ত্যাগী

নেতারা দূরের বাদ্য শুনুকগে। যারা বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যবসাতে বিনিয়োগ করবে, দল ক্ষমতায় গেলে পূর্ব-ত্যাগের মহিমায় ফায়দা তো তারা নেবেই।

এছাড়া সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ কেউ আর ঝুট-ঝঞ্ঝাটে ইদানীং জড়াতে চায় না। মিটিং-মিছিল হরতাল বুঝতে চায় না। তারা জানে ক্ষমতায় থাকতে যতই প্রতিজ্ঞা, শপথ করুক না কেন 'বিরোধী দলে গেলেও আর কখনো একদিনও হরতাল করবো না,' ওসব টপকা বাক্য। ক্ষমতার পালাবদল হলেই জিহ্বারও পালাবদল হয়। এ এক আজব দেশ! 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

মূল কথা হলো, 'আমি যা বলি তাই তোমরা করো, আমি যা করি তা তোমরা করো না।' 'সত্য তাহাই যাহাই রচিব আমি।' সাধারণ মানুষের নিদেন বুঝ হলো, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসারে টিকে থাকতে হবে। তাদের অংশগ্রহণে দেশের কোনো কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই হবে না। আর দেশে যেহেতু নতুন ভোট-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততারও আর দরকার নেই। নিজ সংসারের চাকা নিজেকেই ঘোরাতে হবে। যেহেতু জীবনে দুনম্বরি কোনো ধান্ধাবাজি করবো না, তাহলে নিজ-ধান্ধায় সংসার করাটাই ভালো। কোথায় কে ক্ষমতার মসনদে বসলো, দেশ বিক্রি করলো– অত সব দেখভালের দায়িত্ব সাধারণ মানুষ আর নিতে চায় না, নেয়ার ক্ষমতাও নেই। 'ঠেলার নাম বাবাজি।' 'অন্নচিন্তা চমৎকার।' 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' কী হবে ঐ সব ঝুট-ঝামেলায় গিয়ে 'শহীদ' হওয়ার! ওসবের মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং ওতে আওলাদবর্গ অকালে এতিম হবে, বিবিজান বিধবা হবে। তাছাড়া, 'মজা মারবে ফজা ভাই, আমার কেবল ঘুম কামাই' করার দরকার কি?

এসব বিবেচনা করেই সাধারণ মানুষ মনে মনে সব বুঝলেও, সত্যের পক্ষে নৈতিক সাপোর্ট থাকলেও সক্রিয়ভাবে ঝুঁকির কাজে অংশ নিচ্ছে না। আর মহাতাবরা 'নগদ ধরা'র নীতি আদর্শের তরিকা নিয়ে সঠিক(?) পথেই আছে বলে মনস্তাত্ত্বিক সান্ত্বনা পাচ্ছে।

আমি মহাতাবকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোনোর পরামর্শ দিলাম। মহাতাব উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাথে সামনের দিকে এগোতে শুরু করলো।

আমিও জানতাম আগামীকাল হরতাল। বিকেল থেকেই রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি ভাঙচুর হবে, আগুন জ্বলবে, সকাল সকাল বাসায় ফিরতে হবে, ইত্যাদি। এ বোধ শুধু আমার কেন, এ-দেশের একটা ল্যাংটা বাচ্চারও আজকাল জন্মেছে। কিন্তু 'গরজ বড় বালাই'। আমি তো ফাঁদে পড়েছি আমার গরজে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রী আমার এক আত্মীয়কে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে। সরকারি হাসপাতালের অবস্থা– সেও তো প্রত্যেকের অভিজ্ঞতালব্ধ এক পুরোনো উপাখ্যান– বারান্তরে বলবো।

এখন ভাবছিলাম, একবার দেখি দোয়েল-চত্বরের ওদিকে গিয়ে যদি ভাগ্যগুণে একটা বিআরটিসি বাস পেয়ে যাই তো হ্যান্ডেল ধরে দরজায় বাদুড়-ঝোলা হয়ে যত রাতই হোক অন্তত বাসায় পৌঁছাতে তো পারবো। আর পথে ছোড়া-বোমায় জীবনটা গেলে অন্তত সুহৃদ(?) রিপোর্টারদের বদৌলতে আগামীকালের পত্রিকাগুলোর হেডলাইন হওয়া যাবে। বাস আসার সেই শুভক্ষণের অপেক্ষা থেকেই মহাতাবের সাথে আলাপচারিতা। আলাপে মহাতাবকে খোলামনের মানুষ বলেই মনে হয়েছে। কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। সে এর আগেও বিভিন্ন দলের হয়ে গাড়ি ভেঙেছে, গাড়িতে আগুন দিয়েছে বলে জানাল। আমাকে মাস্টারমানুষ জেনেই হয়তো মনখোলা হয়ে কথাগুলো শোনাচ্ছে।

আমি মহাতাবের কথা শুনছি, নিজে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি, মনে মনে অনেক কথাই ভাবছি– আবার কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। আজ 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা,' কিন্তু 'মনে মনে'। একবার ভাবছি– কী ভালোই না হতো, এ দেশে যদি আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ থাকতো! কী ভালোই না হতো, এ দেশে যদি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন না-হয়ে নির্মল রাজনীতির চর্চা হতো! এই জনগোষ্ঠীকে মনুষ্যত্বের আদলে যদি জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যেত!

মহাতাব তার কথা বলেই চলেছে– এই কবছর আগেও যখন ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলে ছিল, ঢাকায় এক বড় হোটেলের পাশের রাস্তায় বিআরটিসি বাসে গান-পাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে 'কে বা কাহারা' বাসের মধ্যে একসাথে ছয়জন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার হাতেখড়ি নিয়েছিল। পরে ক্ষমতার পালাবদল হলে অনেক মহাতাবই 'পেট্রোল বোমা' যানবাহনে ছুড়ে আরো বেশি

সংখ্যক লোক মেরে হাত পাকিয়েছে। আগেরটার বিচার আগে হয়নি, কিন্তু পরে-পোড়ানোর বিচারের জন্য ব্যাপকভাবে মামলা ঠোকাঠুকি হয়েছে। কেউ দায় স্বীকার করে না। যে মরে সে-ই মরে বাঁচে, পরে তার আর পুড়ে মরার রিস্ক থাকে না– এটা একটা বাড়তি সুবিধা। মহাতাব তো সব দলের হয়েই কাজ করে, তবে এক-দলের হয়ে কাজ করা দোষের-কাজ না হলে, অন্য দলে গিয়ে একই কাজ করলে দোষ হবে কেন? আগের বিচারটা আগে হোক।

মহাতাবের আরো প্রশ্ন আছে– আচ্ছা, একজন পকেটমার কি অন্য একজন পকেটমারকে গণপিটুনি দেয়ার কাজে অংশ নিতে পারে? বিচার করার নৈতিক ক্ষমতা কি তার আছে? 'আপনি আচরি ধর্ম, পরকে শেখাও'– কথাটারই-বা অর্থ কী? মহাতাবের মাথায় এ সমীকরণ আদৌ ঢোকে না।

মনে মনে ভাবছি, এসব খাঁটি চুলচেরা বিশ্লেষণ ও দোষ-গুণ বিবেচনা করে কথা বলার লোকও তো এ-দেশে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যেমন– দু-চোখওয়ালা লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। এ প্রজাতি এ-দেশ থেকে অচিরেই হয়তো উধাও হয়ে যাবে। তখনই হয়তো দেশের উন্নয়ন কেবল ত্বরান্বিতই হবে না, প্রকৃত শান্তি বিরাজ করবে। ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড সৃষ্টি না-করে আইনের যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ থাকতো! তাহলে গান-পাউডার বা পেট্রোল বোমায় এতগুলো নিরীহ লোকের প্রাণ নিশ্চয়ই যেত না। আবার সাভারে 'রানা প্লাজা' ধসে হাজার হাজার নিরীহ গার্মেন্টসকর্মীর প্রাণও নিশ্চয়ই যেত না। রাজনীতিতে যদি সোশ্যাল-টাউটদের পরিবর্তে সুশিক্ষিত, নৈতিকতাসম্পন্ন, চরিত্রবান লোকগুলো যেতো! তাহলে নিশ্চয়ই মহাতাবকে ভাড়ায় আনতো না। মহাতাবের যদি সুশিক্ষা থাকতো! তাহলে নিশ্চয় এমন অনৈতিক কাজে এভাবে আসতো না। সবই এ-জাতির দুর্ভাগ্য।

আমিও এক চোখে ভালো দেখিনে, প্রয়োজনের তাগিদে চশমা কিনে নিয়েছি। চশমাটা চোখে দিয়ে নিলাম। মূল কথা হলো– সত্য অপসৃত, মিথ্যার দাপট বিদ্যমান। মানুষ হিসাবে কে কেমন– এটা বর্তমান সমাজে বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, রাজনীতি– কে কোন দল করে। আমার দল করলেই তাকে আমি ভালো লোক বলবো। যত খারাপ কাজই করুক না কেন, তাকে আমি

ধোয়া-তুলসীপাতা বলবো, পাশে রাখবো। পূর্ণ সমর্থন দেব। জিব ও চোখ উল্টিয়ে কথা বলবো। সাত খুন মাফ করে দেব, তার পক্ষে ওকালতি করবো, তার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী যা করার সবই করবো।

আমরা সবাই দলীয় উন্মাদনায়, স্বার্থের খেলায় বিবেকের কাছে হার মানছি, দলীয় ঢেউয়ের তালে তালে ডুবছি ভাসছি। আত্মজিজ্ঞাসা বলে আদৌ কিছু নেই। অনুকূল বাতাস বুঝে মতলববাজ হয়ে সুবিধাবাদী চরিত্রে অভিনয় করছি। 'বাউ বুঝে ফেলছি ছ্যাপ, মানুষ বুঝে মারছি খেপ।' বাউ তো বুঝতেই হবে, খেপ মারতে হলে। 'মারবো গুলি এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে।' কত চতুর বুদ্ধিই-না আঁটছি এই শুভক্ষণে! কামিয়াবও হচ্ছি।

আমার নিরুত্তর ভাব দেখে মহাতাব আবার তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকলো। সে তার অভিজ্ঞতায় দেখেছে, যত বাসই পোড়ানো হোক না কেন, এর মধ্যেও কিছু কিছু বিআরটিসি বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। সরকার চালায়, সরকার জনগণের সরকার। জনগণের প্রতি সরকারের একটা দরদ ও কর্তব্য আছে না! মহাতাব তো জনগণেরই একটা অংশ। তাই সে যতই বাস পোড়াক, একটু রাত হলে আবার ঐ বিআরটিসি বাসে চড়েই বাড়ি ফেরে! সেও জানে, নেতারা গাড়ি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়। পথের কোথাও নিরাপদ স্থানে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সভাস্থলে আসে। আবার সভা শেষে সেখানে গিয়ে গাড়িতে চড়ে বাড়ি যায়। মহাতাব সব সময় এটা লক্ষ্য করে, নেতারা তার পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়, ওকে কখনো গাড়িতে উঠতে বলে না। সুতরাং সে যতই বিআরটিসি বাস ভাঙুক আর আগুন দিক, সেই বিআরটিসি বাস ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না। তার জন্যই তো এ-দেশে বিআরটিসি বাস আমদানি করা হয়েছে। বিআরটিসি বাস মানে তো তাদেরই বাস। ওটাতেই তো আগুন দেয়, আবার চড়ে বাড়ি যায়।

আজ আর মহাতাবের হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। পা দুটো ধরে আসছে। বার বার বিআরটিসি বাসের কথা মনে পড়ছে। আজ পুলিশ ও বিরুদ্ধদলের মস্তানরা মহাতাবদের বড় রকমের দাবড় দিয়েছে। সে দৌড়ে প্রাণে বেঁচেছে। এখন আর পা চলছে না। আমার সাথে হাঁটছে, আর বার বার পিছু ফিরে তাকাচ্ছে। ভাবছে– না জানি একটা বিআরটিসি বাস পিছন থেকে এসে পড়বে। ইস! এই

মুহূর্তে যদি একটা বাস এসে পড়তো! ওটা তো আমারই বাস। কেন যে আমি অন্যের কথায় ওগুলো ভাঙি, আগুন লাগাই!

আমি মহাতাবের জীবনাভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধি শুনছি, তার সাথে সাথে হাঁটছি। রাজনীতিতে আমার বড্ড বিতৃষ্ণা– ওসব ধান্দাবাজি, মিথ্যার বেসাতি এবং রাজনৈতিক-ব্যবসা, সেই কৈশোর থেকে এ-দেশে দেখতে দেখতে মনে খুব ঘৃণা জন্মেছে। রবীন্দ্র ছোটগল্পের সেই পাগলা মেহেরের কথা কয়টি শিরোধার্য মেনেছি, 'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।' আমার কাছে এ মহামূল্যবান স্বাধীন দেশের স্বাধীন কর্মকাণ্ড, বক্তৃতা, বিবৃতি দেখলেই ঐ পাগলা মেহেরের কথা কয়টি কেন যেন বার বার মনে হয়! এ সমাজে দলমত-নিরপেক্ষ থাকাটা খুবই কঠিন। ছোটবেলায় সেই নেকড়ে আর হরিণশাবকের পানিঘোলা করার গল্প তো সবাই পড়েছি। 'খলের ছলের অভাব হয় না।' কারো কারো স্বার্থেই আমাকে কোনো না কোনো দলের দিকে জোর করে ঠেলে দেবে। প্রয়োজনে চাটুকার মিডিয়া লেলিয়ে দিয়ে অর্ধোলঙ্গ, পূর্ণোলঙ্গ করে ছাড়বে। শেষে জীবন বাঁচানো দায়। তাই জীবনটা কোনোমতে পার করে দিতে পারলেই চিরতরে বেঁচে যাই।

আমি মহাতাবের জীবন-গল্প, আত্মকথন, আত্মপক্ষ সমর্থন, অকপট স্বীকারোক্তি নির্দ্বিধায় শুনলাম, বোঝার চেষ্টা করলাম, মন দিয়ে অনুভব করলাম, বিশ্লেষণ করলাম, মনে মনে অনেক কিছু ভাবলাম, কিন্তু নিজে কোনো মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকলাম। তারপর, তার ঐ রাজনৈতিক স্বার্থ-নিঃস্বার্থভরা(?) কথা শোনার মতো ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম। পরিশেষে, সেই পুরোনো স্বজাত্য ব্যামো পুনরায় চাগান দিল। তাকে ঐসব কথা থেকে বিরত রাখার জন্য বললাম– মহাতাব সাহেব, আপনার অনেক কথাই তো শুনলাম। হাসপাতাল থেকে আসছি, মনের অবস্থা ভালো না। রাজনৈতিক কথা আর ভালো লাগছে না। বরং আমি আমার এক ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা একটা গল্প আপনাকে শোনাই।

মহাতাব ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল দূরে গো-হাট। সেখানে গরু, মোষ, ঘোড়া ইত্যাদি প্রতি সপ্তায় নির্দিষ্ট দিনে বিক্রি হয়। অনেক দূর থেকে মানুষজন

এসব পশু বেচাকেনা করতে এ-হাটে আসে। সুযোগমতো অনেকে চোরা-গরুও এ-হাটে উঠিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করে। কারো গরু হারালে কেউ কেউ এ-হাটে গিয়ে পাহারা দেয়, নিজের গরুটা খুঁজে ফেরে। গরুচোর অল্প সময়ে, কখনো অল্প দামে গরুটা তাড়াতাড়ি বিক্রি করেই কেটে পড়ে।

ঘোড়া যেখানে বিক্রি হয়, তার সামনে একটা বড় ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঐ মাঠ কেউ এক-পাক, দু-পাক দিয়ে বুঝে, শুনে, দেখে তারপর ঘোড়া কেনে। এক লোক এসেছেন ঘোড়া বিক্রি করতে, দাঁড়িয়ে আছেন ঘোড়ার লাগাম ধরে। একজন খরিদ্দার এসে জিজ্ঞেস করলেন– ভাই, ঘোড়াটার দাম কত? দেখি তো, লাগামের দড়িটা একটু হাতে দিন, কেমন চলে একটু দেখে আসি।

লোকটার পায়ে ছিল একজোড়া চটি-স্যান্ডেল। চটিটা খুলে রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, লাগামটা শক্ত করে ধরে দিলেন দাবড়। একেবারে মাঠের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন। তারপর ঐ-দিক থেকে আর ফিরলেন না, ঐ দূরে উধাও হয়ে গেলেন। বিক্রেতা কিছুক্ষণ সে-পথ চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন, ক্রেতা ভদ্রলোকের ফিরে আসার সম্ভাবনা আর নেই। বিক্রেতা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রেখে-যাওয়া চটিটা পায়ে দিয়ে ফিরে আসার জন্য পাশ ঘুরছেন। অমনি পাশ থেকে অন্য-এক ভদ্রলোক কৌতূহলের সুরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– ভাই, ঘোড়াটা কত দামে বেচলেন?

ঘোড়াওয়ালার সপ্রতিভ উত্তর– সে-দামেই বিক্রি, যে-দামের ঘোড়া, লাভের মধ্যে চটি-জোড়া।

এতক্ষণে আমরা দুজনে শাহবাগের মোড়ে পৌঁছে গেছি। মহাতাব যাবে সোজা উত্তরে, আমি বামে মোড় নেব। হাত নেড়ে একবার মহাতাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার পথ ধরলাম। মহাতাব মৃদু হাসির রেখা ক্লান্ত-ঠোঁটে তুলে সামনে এগোলো।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

‘সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?’

সুজন মাস্টারের মাথায় অদ্ভুত-অদ্ভুত চিন্তা সবসময় কাজ করে। কেন করে তিনি নিজেও জানেন না। কখন কী ভাবেন তাও বলা কঠিন, সে-মতো কাজ শুরু করে দেন। কোনো একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তায় মগজটাকে স্থির রাখতে পারেন না। অস্থির প্রকৃতির লোক তিনি। মনে মনে বিভিন্ন ঘটনার এবং অবস্থার পিছু-পিছু ছুটতে থাকেন, সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য খুঁজতে থাকেন, আনুপূর্বিক ভাবতে থাকেন। মনটা এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই মানসিক অস্থিরতা দেখে তাঁর মা তাঁকে ছোটবেলায় বলতেন, ‘তোর এই পিঠের শিরদাঁড়ায় বাঁদরের হাড় লাগানো আছে।’ সুজন মাস্টার তখন তাই বিশ্বাস করতেন।

ছোটবেলার সেই সুজন এখন মাস্টারসাহেব হয়েছেন। জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে তাঁর আর কিছুই করতে ভালো লাগে না, শুধু ভাবতেই ভালো লাগে। জীবন ও জীবিকার তাগিদেই তিনি মাস্টারি করেন। পারতপক্ষে ঝুটঝামেলা এড়িয়ে চলেন। হাতির পিঠে চিমটি কাটার বদভ্যাসই বলুন, আর দুঃসাহসই বলুন তাঁর কোনোদিনই তা নেই। তবে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে হাতিকে চিমটি তো দু-একটা কাটতেই হয়। এতে যে হাতির কিছু যাবে-আসবে না, তাও সুজন মাস্টার ভালো করেই জানেন।

সুজন মাস্টারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকার ধানমন্ডি পনেরো নম্বরের কাছাকাছি। তিনি থাকেন মিরপুর এক নম্বর থেকে বেশ ভেতরে। ত্রিশ টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে এক নম্বরে এসে তারপর কর্মস্থলে যেতে হয়। সুজন মাস্টার সাধারণত মিরপুর এক নম্বর থেকে ঝিগাতলাগামী টেম্পোতে যাতায়াত করেন। টেম্পোগুলোতে সামনের সিটে দুজন যাত্রীকে ঠাসাঠাসি করে বসায়। আজ সুজন মাস্টার সামনের সিটে উঠে ড্রাইভারকে অন্য যাত্রী নিতে বারণ করলেন।

তিনি একাই দুই সিটের ভাড়া দেবেন বলে জানালেন। টেম্পোর হেলপারকে দিয়ে সংলগ্ন চায়ের দোকান থেকে এক হালি কলা ও এক প্যাকেট বিস্কুট আনালেন। দুটো কলা ও বিস্কুটের প্যাকেটটা ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খেতে বললেন। ড্রাইভার একটা কলা খেয়ে আরেকটা কলা ও বিস্কুটের প্যাকেটটা সামনে রেখে দিল। কথায় কথায় ড্রাইভার সুজন মাস্টারকে আঙ্কেল বলে সম্বোধন করলো। ওর বয়স বাইশ-তেইশ হবে। হালকা পাতলা গড়নের বিবর্ণ চেহারা। টেম্পো এতক্ষণে ভরে গেছে, সামনের দিকে এগোতে আরম্ভ করেছে। কোথাও রাস্তাভরা রিক্সার কারণে আস্তে আস্তে যাচ্ছে, আবার কখনো কখনো যানজটের কারণে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ থেমে থাকছে। সুজন মাস্টার ড্রাইভারের সাথে ইতোমধ্যেই আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন। অন্য অনেক কথার ফাঁকে ফাঁকে তার ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জেনে নিয়েছেন।

ওর নাম সোহেল। মিরপুর এক নম্বরের পাশে এক বস্তিতে থাকে। একাধারে প্রতিদিন টেম্পো চালানো সম্ভব হয় না। অন্য আরেকজন ড্রাইভার আছে। একই টেম্পো পালাক্রমে দুজনে চালায়। সংসারে বড় ভাই ছিল। কয়েক বছর হলো সে বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে, তাদের কোনো খোঁজ রাখে না। বর্তমান সংসারে সে ছাড়াও মা-বাপ ও ছোট দুটো বোন আছে। বাবা ফ্লাস্কে করে সকাল-বিকাল চা ও সাথে কিছু বিস্কুট নিয়ে দোকানে দোকানে কিংবা নিম্ন-আয়ের ভাসমান খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করে বেড়ায়। মা অসুস্থ, বিভিন্ন রোগে ভুগছে। কোমরের পিছনের ব্যথাটা হরহামেশা ভোগায়। প্রায়ই বমি হয়, জ্বর হয়। খেতে পারে না, শরীরে শক্তি পায় না। উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘোরে। শরীরটা একটু ভালো লাগলে বিকেলে পথের ধারে বসে চিতই পিঠে তৈরি করে বিক্রি করে। এখন বোন দুটোকে বিয়ে দেয়াটাই বড় চিন্তা। বোনদের বিয়ে না দিতে পারলে সে নিজেও বিয়েশাদি করতে পারছে না। অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করানোটা তার জন্য জরুরি। ওষুধের দোকানে বসে, এমন দুজন ডাক্তারকে দিয়ে মাকে ইতোমধ্যেই দেখিয়েছে। কোনো কাজ হয়নি। দিনে দিনে শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

কথায় কথায় টেম্পোটা শ্যামলী এসে পৌঁছেছে। শ্যামলী মোড়ে আসতেই সোহেলের সমবয়সী এক ছেলে এসে সোহেলের কাছে টাকা চাইল। সোহেল পরবর্তী খেপে দেবে বলে জানালে সোহেলের সাথে সে খুব দুর্ব্যবহার করলো।

কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সোহেল তাকে দুশো টাকা দিয়ে বিদায় করলো। সুজন মাস্টার এই পথে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে এবং ড্রাইভারদের বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিতে প্রায়ই দেখে। সুজন মাস্টার টাকা দেয়ার বিষয়টা নিয়ে শানে-নজুলসহ বিস্তারিত অনেক কথাই সোহেলের কাছ থেকে শুনলো।

সোহেল আজ চার বছর এ পথে টেম্পো চালাচ্ছে। এর আগে সে বাসে দু বছর হেলপারি করেছে। সোহেলের সাথে রোজগারের কথা ওঠাতেই সে সোজাসুজি হিসাব দিল। যে টাকা প্রতিদিন ভাড়া থেকে আদায় হয়, তার সাতশো টাকা যায় পথ-খরচ, মালিককে দেয় পাঁচশো টাকা। টেম্পোর গ্যাস খরচ লাগে। এসব বাদে আটশো টাকা থাকলে সে নেয় পাঁচশো টাকা, আর তিনশো টাকা হেলপারকে দেয়। ছয়শো টাকা থাকলে নিজে নেয় চারশো টাকা, বাকি দুশো হেলপারকে দেয়। মাঝখানে হেলপারকে সাথে নিয়ে দুবার হোটেলে খায়।

এই রুটে প্রতিদিন যেসব টেম্পো যাতায়াত করে, টেম্পোপ্রতি প্রতিদিন সাতশো টাকা করে পথ-খরচ দিতে হয়। শুরু থেকে গন্তব্য পর্যন্ত মোট চার জায়গায় টাকা দিতে হয়। বিভিন্ন সমিতির নাম করে স্থানীয়ভাবে এই টাকাটা উঠানো হয়। ঐসব অঞ্চলের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় টাকাগুলো কৃত্রিম সমিতির নামে স্থানীয়ভাবে উঠছে। টাকাগুলো কোথায় যায় তা কেউ জানে না। এর অন্তরালে বিরাট একটা চক্র অবলীলাক্রমে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন রাঘব-বোয়ালরা এতে জড়িত– 'কান টানলে মাথা আসে' অবস্থা। প্রতিদিন যা আদায় রোজগার হয়, তা অনেক নিচু থেকে অনেক উপর পর্যন্ত যায়। কখনো কোনো পত্রিকার রিপোর্টার, কিংবা মিডিয়ার কোনো ব্যক্তি এ-নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে দায়সারা গোছের একটা মৌখিক বিবৃতি, কল্যাণমুখী কিছু কথাবার্তা শুনিয়ে সদম্ভে সরে চলে যায়। মিডিয়াও কেন জানি চুপ হয়ে যায়। কিন্তু খেলাটা কোনোদিন কোনোক্রমেই বন্ধ হয়ে যায় না।

খেলা শুরু হয়েছে অনেক বছর হলো। এর শেষ নেই। দিন যত এগোচ্ছে, খেলা তত জমছে– বছরের পর বছর চলছে। বুদ্ধি যত বাড়ছে, শোষণও তত পাকাপোক্ত হচ্ছে। সোহেল এভাবে টাকা দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ পেশাতে চলতে গেলে টাকা তাকে দিতেই হবে। সে এবং টেম্পোর মালিক এটাকে ব্যবসার একটা বিদ্যমান রীতি হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ দেশে এ লাইনে

ব্যবসা করতে গেলে এভাবেই চলতে হয়– নইলে বিদায়, বন্ধু বিদায়! কে আছে তাদের এসব কথা শোনার? সবাই ভক্ষক কিংবা নির্জীব, আর না হয় অক্ষম। অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া টিকে থাকার আর উপায় কী! লোম বাছতে গেলে যে কম্বল উজাড় হবে। আর লোমটা বাছবেই-বা কে? এটা এ-দেশের অলিখিত বিধান। শোষণের হাতিয়ার। সরকার বদল হয়, মানুষ বদল হয় কিন্তু এ-বিধান বদল হয় না, শোষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। শোষণের খাতও বাড়ে।

প্রত্যেকটা সচেতন মানুষ এ ধরনের শোষণ কেন হয়, কীভাবে হয় তার আদ্যোপান্ত জানেন, কিন্তু অলিখিত বিধান বিধায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন, দেখেও না দেখার ভান করেন। সব অব্যবস্থাই গা-সওয়া হয়ে গেছে। এটাই সুজন মাস্টারের ভাবনা। আজ এ বিষয়টা তাঁর চিন্তায় আবার নতুন করে ঝড় তুললো। তিনি আর সামনের সিটে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না, কিন্তু কীই-বা তাঁর করার আছে! তিনি তো বিশাল অপশক্তির কাছে অতি ক্ষুদ্র একটা মাস্টারমশায়, মতান্তরে 'মাস্টার-মশা' মাত্র। তিনি আগে একটা কথা শুনতেন, 'জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো।' এখন মনে হয়, 'কর্ম হোক যেমন তেমন, জন্ম হোক ভালো।' ভালো পরিবেশে জন্মালে নিজের অনেক খারাপ স্বভাবও কালক্রমে ভালো হয়ে যায়। সুজন মাস্টারের ভাবতে অবাক লাগে, এই কি সেই বাংলাদেশ যা তাঁরা চেয়েছিলেন! যার স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন! যা দিনে দিনে সকল অব্যবস্থার আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

সুজন মাস্টার স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কিশোর বয়সে যেদিন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গাইতে পেরেছিল, সেদিন বুকের ছাতি তিন-ইঞ্চি ফুলে উঠেছিল। দিনে দিনে কী যে হলো! 'কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেল,' অতি আশার 'সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেল।' এখন আর কোনো কিছুতেই সুজন মাস্টারের বুক ফুলে ওঠে না, কারো কোনো কথায় উদ্দীপ্ত-উজ্জীবিত হন না। কেন হন না, তিনি নিজেও তা বোঝেন না, শুধু আশাহতের বেদনায় ভোগেন। ভাবেন, রক্ষকই এ-দেশে ভক্ষক।

সুজন মাস্টার মনে মনে একটা হিসাব কষলেন। মিরপুর এক নম্বর ও দশ নম্বর থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে কমপক্ষে দুইশো টেম্পো প্রতিদিন যাওয়া-আসা করে। এমনিভাবে এ বিশাল ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ

হাজার টেম্পো বিভিন্ন রুটে যাতায়াত করে। স্থানীয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে টেম্পোপ্রতি ছয়শো টাকা করে চাঁদা রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের পকেটে গেলেও তো প্রতিদিন শুধু টেম্পোখাতে মোট চাঁদা আদায় হয় সোয়া কোটি টাকার বেশি। এত টাকা! ভাবতেই চোখ চড়কগাছে উঠে যায়। এত টাকা কোথায় যায়? আর রাস্তায় তো শুধু টেম্পোই চলাচল করে না, বাস-ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন তো আছেই। তাহলে রাজনীতির ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়া দিয়ে রাজনীতির শাখাপ্রশাখা খুলে শুধু যানবাহন খাত থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা লুটে নিচ্ছে! কেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এরাই তো কথা দিয়েছিল– শোষণমুক্ত সমাজ গড়বে, দেশ গড়বে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছিল। এখন তো দেখছি সে ফেনা শুকিয়ে গেছে, সে মুখ এখন অন্য ভাষা, অন্য কথা বলে। অন্য ধুয়োজারির ধুয়ো ধরেছে। অথচ এরাই সোহেল গংয়ের বাপ-চাচাদের কথা দিয়েছিল। যদি প্রশ্ন করা হয়– সোহেলের বাবা এখন রাস্তায় রাস্তায় চায়ের ফ্লাস্ক হাতে করে বেড়ায় কেন? তার ছেলে নিরক্ষর হয়ে বিবর্ণ শরীর নিয়ে টেম্পো চালায় কেন? তার ছেলেকে রাজনৈতিক মস্তানদের চাঁদা দিয়ে টেম্পো চালাতে হয় কেন? সোহেলের মায়ের চিকিৎসা জোটে না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

সুজন মাস্টার কোনোক্রমেই নিজেকে সংযত করে রাখতে পারেন না। মনকে সংবরণ করতে পারেন না। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে– 'সে-কথা দেয়ার কী হলো? সে-কাজের কী হলো?'

সুজন মাস্টার ছোটবেলায় হাফপ্যান্ট পরে নিকটস্থ বাজারে প্রতি হাটবারে দর্শকদের সারিতে সামনে বসে ক্যানভাসারদের ঔষুধ বিক্রি দেখতো। তাদের সাথে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী একটা ছেলে একটা ঢোল গলায় ঝুলিয়ে, বাজাতে বাজাতে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে গান গাইতো। গান গাওয়ার সময় গলার স্বর উঁচুতে উঠিয়ে এত জোরে সুর টানতো যে, গলার দু-পাশের শিরাগুলো ফুলে উঠতো। ছেলেটা 'ফল'কে উচ্চারণ করতো 'পল'। 'ভ'-কে উচ্চারণ করতো 'ব', 'খ'-কে 'ক'। টেনে টেনে গাইতো, 'মাকালের পল দেক্‌তে বালো-ও, উপ্‌রি লাল বিত্‌রি কালো।' 'কালো' কথাটা উচ্চারণের সাথে সাথে ঢোলে একটা বড় রকমের চাটি মেরে তাল দিত। এই 'উপ্‌রি লাল বিত্‌রি কালো'

কথাটা এবং সে-সাথে বড় চাটি মারার শব্দটা আজও সুজন মাস্টারের কানে বাজে, মনের গহিনে নাড়া দেয়, আর এ-দেশের মুখসর্বস্ব পূত-পবিত্র রাজনীতির বংশাবতংসদের কথা ও সেই চাটি মারার কথা বার বার মনে হয়। কেন হয় তা সুজন মাস্টার নিজেও জানেন না।

সুজন মাস্টার টেম্পোর সামনেই বসে আছেন। টেম্পোটা শিয়া মসজিদের কাছের স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই সোহেল আবার একজন নির্ধারিত ব্যক্তিকে দেড়শো টাকা দিল। সুজন মাস্টার সেদিকে একবার তাকালেন, কিছুই বললেন না। তাঁর অস্থির মন তখন আর সোহেলের টাকা দেয়ার দিকে নেই– অনেক পিছনে, অতীতে চলে গেছে। জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে মনে পড়ছে তাঁর বন্ধু-সহকর্মী মিজান সাহেবের কথা, তাঁর অবস্থার কথা, জীবনের বাস্তবতায় ভুগে ভুগে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

মিজান সাহেব ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ক্লাসে সব সময় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকতেন। তিনি ইদানীং মনের অজান্তেই সহপাঠী-বন্ধুদের সাথে নিজেকে তুলনা করেন– কী পেয়েছেন, আর কী পাননি হিসাব মেলান। তাঁর সাথে পড়ত এক ছেলে। ছেলেটা ক্লাস সেভেনে উঠতে না উঠতেই বখে গিয়েছিল। লেখাপড়া আর হয়নি, ঐ পর্যন্তই বিদ্যার্জন। বাসার পাশে পুরো উত্তরবঙ্গগামী গাড়ির বাস-টার্মিনাল। বিশাল বিচরণক্ষেত্র। নষ্ট হওয়ার অবারিত সুযোগ। ঐ বয়সে জীবনের অনেক অবাঞ্ছিত পাওয়াকে সঞ্জীবনী সুধা বলে মনে হয়। দিনে দিনে ছেলেটার বয়স বেড়েছে– সে সাথে বেড়েছে মস্তানীর অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক শিক্ষাগুরুদের সাথে যোগাযোগ, রাজনৈতিক ছত্রছায়া। একসময় পুরো বাস-টার্মিনালটা তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, কায়েম হয় তার রাজত্ব। বিশাল মস্তানবাহিনীর সর্দার সে। সেরা সেরা কয়েকজনকে সব সময় সাথে রাখে। কী আনন্দপুরী! অভয়ারণ্য! পাঁচ বছরের মধ্যেই বাস-টার্মিনালের আশপাশ এলাকায় পাঁচ-ছয়টা আলিশান বাড়ির মালিক। ব্যাংকে টাকা বেশুমার। একটা গাড়িতে পোষায় না, তিন-তিনটে লাগে। মাঝারি উচ্চতার কোটি-টাকার গাড়িটা আবার কালো গ্লাসের আবরণে মোড়া, শানশওকতে ভরা। বডিগার্ড হিসেবে পাঁচ-ছয়জন রাজনৈতিক মস্তান সাথে থাকেই। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সরকার থেকে একটা অস্ত্রের লাইসেন্স নিজ নামে বরাদ্দ নিয়েছে। অবৈধগুলো থাকে বডিগার্ডদের

হাতে। বাসায় কোকিলকণ্ঠী খুবসুরত রমণীদের অবাধ আনাগোনা। উন্নতমানের বিদেশী বোতল ছাড়া রাত কাটে না। কী-এক সাদ্দাদের বেহেস্তখানা! বিধাতা স্বয়ং এবং এ-দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাকে এসব উপহার দিয়েছে। 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?' মিজান সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখেন। চলতি পথে দেখা হলে বাল্য-সহপাঠীর সাথে হাত মেলান, কুশল বিনিময় করেন।

মিজান সাহেব এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করার পর দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে ভালো রেজাল্ট করে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেছেন। মাসে যা বেতন পান ঘরভাড়া দিতেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। সারাটা মাস অর্থনৈতিক দীনতায় কাটে। 'নামেই তালপুকুর, ঘাটে ঘটি ডোবে না।' সংসার জীবনে অভাব-অভিযোগ যদি ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকে, প্রেম-প্রীতি ভালবাসার বন্ধন জানালা দিয়ে পালায়। নৈতিকতার কারণে কলেজে টিউশনি করতে পারেন না। শেষে বাপ-মার পকেট তাঁর শেষ ভরসা, বাঁচার অবলম্বন। বাপ-মা আর ক দিন ছেলেকে এই আর্থিক সংস্থান করে যাবেন! অবশেষে, ইহলীলা সাঙ্গ করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

মিজান সাহেব এখন মুক্ত। তিনি দেশীয় বাস্তবতা বুঝতে শিখেছেন। নিজের মনকে বুঝ দিতে শিখেছেন। ছোটবেলায় পড়া 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়ায় চড়ে সে' প্রবচনের পরিবর্তে তিনি এ-দেশের একান্ত জীবন-থেকে-নেয়া 'উচিত শিক্ষা' পেয়েছেন এভাবে– 'লেখাপড়া করে যে, ভাত বেগরে মরে সে'। ভালো তদবিরবাজ নন বলে, জায়গামতো টাকা ঢালতে পারেন না বলে, সত্যপথে চলেন বলে প্রতিটি পদে পদে তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। তিনি ইতোমধ্যেই পরিবার-পরিজনকে পিছনে ফেলে খাগড়াছড়ি পোস্টিং পেয়ে কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছেন।

কয়েক দিন আগে সুজন মাস্টারের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। চাকরিজীবনের শেষ প্রান্তে এসে শেষ বারের মতো দক্ষিণাঞ্চলের মনোলোভা প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর সুন্দরবনের অনতিদূরে বানরের কিচিরমিচির এবং বাঘের হুংকার উপভোগের জন্য মিজান সাহেবকে কর্তৃপক্ষ একটা ভালো পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু মিজান সাহেব জীবনের ঘানি টানতে টানতে এখন বড্ড ক্লান্ত,

পরিশ্রান্ত। পা দুটো থেমে আসে। মনোলোভা প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে আর আকৃষ্ট করে না। তাঁর 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে-রে আমি আর বাইতে পারলাম না, সারা জীবন উজান বাইলাম ভাটির নাগাল পাইলাম না– আমি আর বাইতে পারলাম না' বলতে খুব ভালো লাগে।

সুজন মাস্টার এতক্ষণে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছেন। সোহেলকে এবার আরেকটা কলা ও বিস্কুট খেতে বললেন। সোহেলের মুখ ও গায়ে-পরা গেঞ্জিটার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। আবার মনের চোখ দিয়ে ওদের রক্ত-চোষা গোষ্ঠীর দিকেও তাকাচ্ছেন। সে সাথে মনে পড়ছে ফেলে আসা অতীত দিনের পশ্চিম-পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণের কথা, ভাগবিমুখ বঞ্চনার কথা, স্বাধীনতার অনুপ্রেরণার কথা। বার বার মনে পড়ছে, এরাই তো কথা দিয়েছিল, সুজন মাস্টারের সামনেই কথা দিয়েছিল। কিশোর সুজন তখন অনেক মিটিং-মিছিলে যেত। হ্যাঁ, এরাই কথা দিয়েছিল। কেউ কি নিজের চোখ আর কানকে অবিশ্বাস করতে পারে? সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল– একটা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বে, দেশ গড়বে। জাতি হিসাবে বাঙালি বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অর্ধ-শতাব্দী তো প্রায় পার হয়ে গেল। কিন্তু সে-কাজের কী হলো? ওরা কি তাহলে একটা জনগোষ্ঠীর সাথে জলজ্যান্ত প্রতারণা করলো? এখন ওদের ভিন্নরূপ। শেষে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত 'চাটার দল' লেলিয়ে দিয়ে চেটেই দেশটাকে নিঃশেষ করে ফেললো? ওরা সতীর্থদের নিয়ে দেশটাতে হরিলুটের মেলা বসিয়েছে। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে পুকুর চুরি, নদী চুরি, ব্যাংক চুরি, পুঁজিবাজার চুরি, টাকার বস্তা চুরি– হরেক রকমের অজস্র চুরিতে হাত পাকাচ্ছে। শেষে বর্তমান যুগের অব্যবহৃত ধামা চাপা দিতে ব্যর্থ হয়ে নানামুখী বড় বড় মুখ-চাপা, মিডিয়া-চাপা দিচ্ছে। প্রয়োজনে দুর্মুখদের জেল-চাপা ও নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে মাটি-চাপা দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। বিদেশী গুরুর দল ওদের সহযোগিতা করছে।

সোহেল দু-পিস বিস্কুট মুখে পুরে সুজন মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললো– আঙ্কেল কী এত ভাবছেন?

সুজন মাস্টার সোহেলের কথার কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু তার মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর মনে তখন বার বার ভেসে আসছে লালনের গানের

সেই কলিটা, 'সেই ভাবনা ভাবছি বসে চমক জ্বরা বইছে গায়, পাখি কখন জানি উড়ে যায়।'

সুজন মাস্টারের এবার ছোটবেলায় মায়ের কাছে শোনা একটা গল্প মনে পড়লো। স্মৃতিপটে ঝাপসা হয়ে আসা গল্পটা মনে করার চেষ্টা করছেন তিনি।

এক গ্রামে ছিল নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য-সম্প্রদায়ের কয়েক ঘর লোকের বাস। তাদের মধ্যে পাঁচজন মিলে অবসর বিনোদনের জন্য একটা গানের দল তৈরি করলো। বিভিন্ন গ্রামে ধুয়োজারির গান গেয়ে বেড়ায় তারা। ঢোল, খঞ্জনির সাথে সাথে স্বভাবমতো দু-তিনটে চাকু, একটা ধারালো দা, একটা অতিরিক্ত থলে তারা আলাদা থলের মধ্যে রাখে। কখন না-জানি কী দরকার হয়!

সারা দিনের কাজ শেষে পড়ন্ত বিকেলে দলের সবাই পার্শ্ববর্তী একটা গ্রামে ধুয়োজারি গাইতে চলেছে। ঐ গ্রামে যেতে বেশ বড় একটা মাঠ পেরোতে হয়। মাঠের মধ্য দিয়ে একটা ভাগাড় দু-গ্রামের সংযোগ রক্ষা করেছে। ওরা সবাই দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে। সন্ধ্যার পরপরই জারির আসর শুরু হয়ে যাবে। আজ আসরে কোন কোন গান গাওয়া হবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। হঠাৎ একজনের চোখ গেল ভাগাড়ের পাশে একটা জমির দিকে। শীতশেষের বিকেলে একটা মোটা-তাজা গরু চার-পা ছড়িয়ে দিয়ে অসাড় হয়ে সটান অবস্থায় পড়ে আছে। সে আনমনে ভাবলো, গরুটা নিশ্চয় মরে গেছে বলে কৃষক এত দূরের এই ভাগাড়ের পাশে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। সে পাশেরজনকে চোখের ইশারায় দেখালো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল। ভাবখানা এরকম 'ঐ দেখ, শিকার পড়ে আছে।' একটু নিরাপদ দূরে গিয়ে সবাই মিলে ছোট্ট একটা বৈঠক করলো। ধুয়োজারির আসরে সময়মতো পৌঁছানোও দরকার, আবার পাছে শিকারও হাতছাড়া হয়ে যায়, এ আশঙ্কায় দুজনকে গরুটার চামড়া ছাড়ানোর কাজ সমাধা করে তারপর জারির আসরে যোগ দেয়ার এবং বাকি তিনজন জারির আসরে এখনই চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। ভাবলো, যেভাবেই হোক শিকার হাতছাড়া করাটা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চামড়াটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। এ দুর্মূল্যের বাজারে কম করে হলেও দেড়-কুড়ি টাকায় এটা বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া মনমতো মাংস সংগ্রহ করে উদরপূর্তি করে ভোজন করাটাও তো অনেক পাওয়া! আর এজন্যই তো ওরা চাকু, দা ও থলে সবসময় সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়।

পরামর্শমতো মূল বয়াতিসহ তিনজন আসরে যোগ দেয়ার জন্য চলে গেল। মন পড়ে থাকলো গরুর চামড়া ও গোস্তের দিকে। বাকি দুজন সেখানে বসে দা ও চাকুগুলোকে আবার ধার দিয়ে চোখা করে নিল। এতে একটু দেরিও হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পিছনে-পড়া দুজন যখন আসরে পৌঁছালো, ততক্ষণে জারির পালা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে লোকসমাগম, জমজমাট আসর। সেই দুজনকে আসতে দেখে সাথী-বয়াতির মন আর মানছে না। মনটা উশখুশ করছে। জানতে ইচ্ছে করছে, 'সে কাজের কী হলো?' খঞ্জন ও ঢোলের তালে তালে নেচে নেচে ধুয়োজারির সুরে বার বার বয়াতির একই প্রশ্ন, 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?'

পরে-আসা দুজনের এমনিতেই মন ভার, তারমধ্যে বার বার সুরে সুরে একই প্রশ্ন। তারা দুজনও ছিল ধুয়োজারির দোয়ার। দোয়ারকি ধরাই তাদের কাজ। নইলে যে তাল কেটে যায়। এভাবে কতক্ষণ আর চুপ থাকা যায়! এতো লোকসমাগমের মধ্যে কীভাবেই-বা সাথী বয়াতিকে বলা যায় যে, চাকু ধার দিয়ে যেই-না গরুর পা ধরে পায়ে চাকু চালাতে গেছে, অমনি গরু পা-টা একটা ঝাড়া দিয়ে উঠেই ঘাস খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেস্তে গেছে। দোয়ার দুজন অনন্যোপায় হয়ে তালে তালে নেচে নেচে ধুয়োজারির সুরে কোমর দুলিয়ে বয়াতির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চললো, 'চাখাইতে চোখাইতে চরণো ধরিতে উঠে ঘাসো খেলো হে।' বসে-থাকা দোয়ার দুজনও ওদের সাথে সুর মেলালো। যতবারই বয়াতির সন্দিগ্ধ প্রশ্নের সুর 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?' দোয়ারদের একই প্রতিউত্তর, 'চাখাইতে চোখাইতে চরণো ধরিতে উঠে ঘাসো খেলো হে।'

এতক্ষণে সুজন মাস্টার ধানমন্ডির পনেরো নম্বরে কর্মক্ষেত্রের প্রায় কাছে চলে এসেছেন। সোহেলকে বলতেই সে তাঁকে নামিয়ে দিল। সামনে ভিড়, অনেক দেরী হবে। টেম্পোর পিছনের সিটও ফাঁকা, যাত্রী সব নেমে গেছে। সুজন মাস্টার দেখলেন, সোহেল গন্তব্যে না-গিয়ে হঠাৎ স্টিয়ারিংটা ডানে ঘুরিয়ে ইউটার্ন নিয়ে টেম্পোটাকে আবার মিরপুরমুখী করে ফেলেছে। হেলপার উচ্চস্বরে ডাকছে, 'মিরপুর এক, মিরপুর এক ...।'

সুজন মাস্টার এবার ভাবনা-ভারাক্রান্ত মনে নিজের পথে হাঁটলেন।

এপ্রিল ২০১৬

নিত্যানন্দ মেলা

কাল পহেলা বৈশাখ। আজ রাত থেকেই শুরু বৈশাখ উদ্‌যাপন। সন্ধ্যার পর থেকেই বাণ্ঠা সর্দার আজ একনাগাড়ে কাজে ব্যস্ত। রাত এখন একটার কাছাকাছি। সে এখন বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে। রাত বারোটা বেজে গেছে মানে বৈশাখ উদ্‌যাপন আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন খরিদ্দারের চাপ নেই বললেই চলে। এবার বাণ্ঠা সর্দার রাতের খাওয়া-দাওয়া করবে বলে ভাবছে। কিন্তু মন সেদিকে যাচ্ছে না। মানসিক বিষণ্নতা ভর করেছে। আর একটা পক্ষ এলেই কাজ আজকের মতো মোটামুটি শেষ।

সন্ধ্যা থেকে মাল সরবরাহের ধকল কম গেল না। এখন একটা জলচৌকির উপর বসে সে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, আর আজকের কথা ভাবছে। সে-সাথে গত বছরের এ-দিনটার কথা আবার মাথায় আসতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাণ্ঠা সর্দারের মাথায় দুঃসহ স্মৃতি নাড়া দিল। গত বছরের দিনটাও ছিল পহেলা বৈশাখ– রাত একটা কী দুটো। মাত্র একটা বছরের ব্যবধান। সে অতীতকে ভুলে যেতে চায় কিন্তু কোনোক্রমেই সেই দুর্বিসহ স্মৃতি ভুলতে পারে না। আজও তাই মুখে হাত দিয়ে বসলো। ভাবছে, কেন এমন হয়েছিল? এমনটি তো হবার কথা ছিল না। তার কি কোথাও কোনো ভুল ছিল? সে তো সব সময় খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টাই করে। তাদের কথা ভাবে, তাদের হয়ে কাজ করে, ভালো সেবা দিতে চায়। ভালো সেবা না দিতে পারলে তো ব্যবসার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না।

তার অনেক বছরের ব্যবসা এটা। দিন দিন প্রসার লাভ করছে। কয়েক বছর ধরে খরিদ্দারের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বেড়েই চলেছে। কথাটা ভাবতে ভালোই লাগে

বাণ্ঠা সর্দারের। সে ছাড়াও এ বাজারে আরও চার-পাঁচটা ওষুধের দোকান সন্ধ্যার পর এ-ব্যবসা করে আসছে। তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হয়।

এ বাজারের অবস্থাও ভালো। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীর এখানে বসবাস। বাজার বলতে জেলাশহর থেকে ঢাকাগামী হাইওয়ের দুপাশ ঘিরে আধা-কিলোমিটারব্যাপী একটা বড় ব্যবসাকেন্দ্র। এছাড়া হাইওয়ে থেকে বেশ কয়েকটা রাস্তা দু দিকে বিভিন্ন থানা পর্যায়ের টাউনে চলে গেছে। ফলে সেসব রাস্তার দু পাশেও লোকালয়, দোকানপাট গড়ে উঠেছে। এতে বাজারের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। বাজারের চারপাশ ঘিরে অসংখ্য গ্রাম। গ্রামগুলোর কেন্দ্রস্থল এই বাজার। জেলাশহর এ বাজার থেকে পনেরো-বিশ মিনিটের পথ।

বাণ্ঠা সর্দার সেই ছোটবেলা থেকে এই বাজারে সুইপারের কাজ করে আসছে। নাম জিজ্ঞেস করলে বলে বাণ্ঠা সর্দার, তবে বাণ্ঠা বললে এ অঞ্চলের সবাই তাকে চেনে। তার সাথে এ কাজে আরো অনেকে আছে। ময়লা পরিষ্কারের এ কাজে নেশা-টেশা একটু না-করলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ছোটবেলা থেকেই তার এ অভ্যাস। সতীর্থরাও তার সাথে নেশা খায়। বাণ্ঠা সেই সাথে বাড়তি কাজ হিসেবে বেশ ক বছর ধরে এ বাজারে নেশা বিক্রি করে আসছে। বাজারের শেষ প্রান্তে একটা বাঁশঝাড়ের পাশে তার ঘর। সারাদিন রাস্তা ঝাড় দেয়া, ময়লা পরিষ্কার করা আর সন্ধ্যার পর থেকে নেশা বেচা-বিক্রি করা তার কাজ। এসব করে বেশ কিছু বাড়তি রোজগার সে করে। থানা ও জেলা পর্যায়ের কিছু কিছু লোকের সাথে তার গোপন যোগাযোগ ও সখ্য ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে। তবে তার রোজগারের অধিকাংশই চলে যায় অন্যের পকেটে। প্রতিদিনের খরিদ্দারদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা টাকা দিতে চায় না। টাকা চাইতে গেলে তেড়ে আসে, মার শাসায়, ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। বাণ্ঠা নীরবে এসব হজম করে।

এ ব্যবসার ধরনটাই একটু অন্যরকম, অন্য ব্যবসা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মদ-মাতাল ও সমাজের ক্ষমতাধর লোক নিয়ে নিয়মিত চলাফেরা। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কিসিমের মানুষজন গোপনে রাতের অন্ধকারে এখানে আসে। আগন্তুকদের মধ্যে উঠতি বয়সী থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সীদের সংখ্যাই

বেশি। বাণ্ঠা যথাসাধ্য গোপনীয়তা বজায় রাখে। খুব সাবধানে ব্যবসা করতে হয়। মালামাল সরবরাহে বেশ যত্ন নিতে হয়, সতর্ক থাকতে হয়। এই যত্নের অভাবে প্রায়ই পত্রপত্রিকায় দুর্ঘটনার খবর বেরিয়ে আসে। অনেক খরিদ্দারই মারা যায়, কেউ কেউ মরণাপন্ন হয়ে যায়, কেউবা অল্প অসুস্থতায় গোপনে চিকিৎসা নিয়ে সেরে ওঠে। ভেজাল মালে বা মেয়াদোত্তীর্ণ মালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কেবল দুর্ঘটনা ঘটলেই বোঝা যায়, ঐ নির্দিষ্ট দোকান থেকে ঐ রাতে কারা মাল কিনেছিল। যদিও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, শুধু যারা মরে বা যাদের হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়, তাদের নামটাই সংবাদে বেরিয়ে আসে। এর বাইরেও শত শত নাম লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যায়। বর্তমান সমাজে প্রতিটা এলাকাতেই এ 'মাল-পানি' টানা লোকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং সঠিক সংখ্যাটা জানলে গা শিউরে ওঠে। এ-এক ভয়াবহ নীরব ধ্বংসলীলা। খোলা চোখে অনুমান করা অনেকটাই দুরূহ।

দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুদিন ধরে কেস-কাটরা চলে, পুলিশের লোক-দেখানো অত্যাচার চলে। 'লাশ উদ্ধার করিয়াছে, তদন্ত চলিতেছে' ইত্যাদি মুখস্ত বিবৃতি দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। অবশেষে, প্রতিদিনের নিত্যনতুন ঘটনায় এ ঘটনাটা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। ভিতরে ভিতরে সবকিছু ম্যানেজ করতে হয়। এই ম্যানেজ করা মানে প্রচুর অর্থ ব্যয়। শেষে ব্যবসাতে টিকে থাকাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটা সুবিধা হলো, এসব ক্ষেত্রে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে খরিদ্দার ও সংশ্লিষ্ট অন্য তৃতীয় পক্ষের সার্বিক এবং সক্রিয় অপ্রকাশ্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাদের স্বার্থেই তারা ব্যবসাটা টিকিয়ে রাখে। এ ব্যবসায় টিকে থাকাটা একটা ত্রিভুজ-প্রেমের উপাখ্যানের মতো, ত্রিভুজাকৃতির অনন্ত সহাবস্থান। এক ভুজে আছে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নীরব জেগে-ঘুমানো সহযোগিতা, অন্য ভুজে আছে ব্যবসায়ী-রাজনীতির, মতান্তরে রাজনৈতিক-ব্যবসার আদর্শে গড়া 'আদর্শবান দেশীয়-সোনার-মানুষ' এবং তৃতীয় ভুজান্তরে আছে ক্রীড়নক ব্যবসায়ী বাণ্ঠা গং। সভ্যতার সাদা আবরণে আচ্ছাদিত সমাজের অন্তরালে এ-এক আত্মঘাতী অসামাজিক খেলা, আনন্দ মেলা– নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছেই, খেলা চলছে হরদম!

এ ব্যবসাতে লাভের পাল্লা বেশ ভারী। কিন্তু পকেটে পয়সা দাঁড়ায় না। বিভিন্ন পক্ষকে ম্যানেজ করতেই লাভের অধিকাংশ চলে যায়। শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাসোহারা ভিত্তিতে একটা মোটা অংশ দিতে হয়, নইলে বেশি পরিমাণ উৎপাত শুরু করে, ব্যবসা উঠিয়ে দিতে চায়; আসলে ব্যবসা বন্ধ হোক, এটা তারাও মন থেকে চায় না। অন্য শত-রোজগারি খাতের মধ্যে এটাও তাদের একটা ওপেন-সিক্রেট স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা। তাছাড়া, এখানে সব সময় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় পাতি-নেতা, থানা ও জেলা পর্যায়ের নেতাদের পর্যন্ত নেতাভেদে মাসিক ভিত্তিতে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। সেখানেও রোজগারের একটা বড় অংশ চলে যায়। এছাড়া স্থানীয় চোরচোট্টা, মস্তান তো সব সময় পিছনে লেগেই থাকে। আবার এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের নাম করে রাজনৈতিক পর্ব-পার্বণে এখান থেকে নিয়মিত বখরা আদায় হয়। এসব বিভিন্ন চলতি খরচ মেটানোর জন্য বেশ কিছু নগদ টাকা হাতে সব সময় ধরে রাখতেই হয়। সব সময় চিন্তা, কী-জানি কখন কোথায় কত লাগে!

রাত একটা বেজে গেলেও বাণ্ঠার আজ আর খাবার খেতে যেতে ইচ্ছে করছে না। মাথায় হাত দিয়ে সেই জলচৌকিটার উপরেই ঠায় বসে আছে। গতবারের এই পহেলা বৈশাখের দুর্ঘটনাটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। যখনই মনে হয়, সে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। আজ আরেকটা ঝামেলা এখনও রয়ে গেছে। রাত একটা বেজে গেলেও 'নেশা প্রতিরোধ কমিটি'র কেউ এখনও আসেনি। সবাই বিদায় হবার পর ওরা আসে। বাণ্ঠার ঘরটা বাজারের শেষ মাথায় হওয়াতে আরো পাঁচ-পাঁচটা দোকান ঘুরে ওদের এখানে আসতে রাত একটু বেশি হয়ে যায়। এ বাজারের 'মাল-টানা' গ্রুপের প্রধান এবং সর্বজনস্বীকৃত কালোবাজারে হচ্ছে 'নেশা প্রতিরোধ কমিটি'র চেয়ারম্যান। সে তার দলবলসহ একটু রাত করেই বাণ্ঠার এখানে আসে। 'মাল-পানি' খায়, আবার উপরিও নিয়মিত নিয়ে যায়। কয়েক বছর ধরে এটা আবার একটা 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' হিসেবে দেখা দিয়েছে। এতদিন তার কাছ থেকে যারা মাসোহারা আদায় করতো তারা তো আছেই, আবার একটা উটকো পক্ষ

নতুন গজিয়েছে। এতে নেশা বিক্রিতে তেমন একটা প্রভাব পড়েনি বটে, তবে 'লাভের মাল পিঁপড়েয় খায়'-এর মতো পিঁপড়ের সংখ্যা বেড়েছে। অবশ্য সে-সাথে ব্যবসার ছত্রছায়াও বেড়েছে। ফলে, টিকে থাকার স্বার্থে বাথ্ঠাও সুযোগমতো মালের দাম একটু বাড়িয়ে দিয়েছে।

শালীনতার কথা হলো, এই 'মাল' বা 'নেশা' শব্দটা সংশ্লিষ্ট মহলে আদৌ ব্যবহৃত হয় না। সাধারণ দুর্মুখেরা এ-ধরনের পুরোনো শব্দ সহসাই ব্যবহার করে বসে। এ লাইনে আনাড়িরা এমনটি করে বসলেও তাতে কেউ কিছু মনে করে না। খরিদ্দার কিংবা মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় এটাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করে। সহসাই নাম পাল্টে যায়। যেমন– বর্তমানে প্রচলিত সাংকেতিক নাম চলছে 'ডাইল'। এ নাম উচ্চারণ করলেই সংশ্লিষ্ট মহল ঘটনাটা ইশারায় বুঝে ফেলে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ছাড়াও এ অঞ্চলে ব্যবসা করার একটা বাড়তি সুবিধা বাথ্ঠার আছে। সেটা সে ভালোই বোঝে। এ অঞ্চলে ব্যবসার মালামালের জোগান পেতে তার কখনও কোনো অসুবিধা হয় না। এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটা চিনির মিল আছে। চিনির মিল লোকসানের বোঝা বইতে গিয়ে দিনে দিনে নিমজ্জমান হলেও প্রশাসনের পকেট লাভে উপচে পড়ছে। সেখানকার প্রশাসনও খুব দক্ষ। তারা 'মাল'-এর একটা অংশের নিয়মিত জোগান দেয়। এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় চোরাপথে এত 'মাল' জোগান দেয়ার পরও উক্ত প্রশাসন যে কীভাবে তাদের স্টোরের হিসাবে মিল রাখে, ভাবলে তাদের দক্ষতার তারিফ না করে পারা যায় না।

তাছাড়া, এখান থেকে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সীমান্ত। মালের অধিকাংশই আসে সীমান্তের ওপার থেকে। নিয়মিত এবং অবারিত জোগান। ওপারের সীমান্তরক্ষীদের সাথে যখনই লেনদেন চুক্তিতে একটু গরমিল দেখা দেয়, কেবল তখনই তারা দু-একটা গুলি ছুড়ে বাংলাদেশী মেরে হাতের নিশানা হালনাগাদ করে। আর মাঝেমধ্যে দু-একটা বাংলাদেশী মেরে হাতের নিশানা ঠিক না করলে তাদের অস্তিত্বই-বা জানান দেয়ার বিকল্প পথ আর কী আছে? এপারে

সীমান্ত পাহারায় যারা আছে, তারা খুব ভদ্র এবং সভ্য। সীমান্ত প্রহরী হিসেবে সদা-সর্বদা জাগ্রত। তাদের নজরদারির বাইরে কোনো মালই ভিতরে আসতে পারে না। তাদের অনেক সদস্য নাকি বিভিন্ন ভিতর এলাকায় কাজ করা পছন্দ না-করে অনেক খরচ-খরচা করে সীমান্তে পোস্টিং নিতে চায়। তাদের বাড়তি রুজি-রোজগার সম্বন্ধে তেমন অতিরিক্ত তথ্য বাণ্ঠার কাছে নেই। তবে অনেকেরই সীমান্তে পোস্টিং নেয়ার পর গ্রামে এসে বেশি বেশি জমি কেনা ও বাড়ি করার অগ্রগতি দেখে এলাকার কেউ কেউ সেদিকে আড়চোখে তাকায়। বাণ্ঠার মতে তদবির করে সীমান্তে পোস্টিং নেয়ার আরেকটা কারণ হতে পারে বিশাল উন্মুক্ত মাঠ, নির্ভেজাল সুবাতাস। এই উন্মুক্ত মাঠে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারলে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে– প্যারেড করার দক্ষতাও বাড়ে। আর সীমান্ত রক্ষা করাই যেহেতু তাদের দায়িত্ব, সেটা তো তারা করবেই, সেখানে তো তারা পোস্টিং নেবেই, এতে বাণ্ঠার কোনো আপত্তি নেই। শুধু মালামালের জোগান নিয়মিত পেলেই সে খুশি, আর কে কী করলো অত খোঁজ তার কীই-বা দরকার!

বাণ্ঠা যে জিনিসটা বোঝে না বা বুঝতে চায় না সেটা হলো তার খরিদ্দারদের পরিবারগুলোর অবস্থা। এই বাণ্ঠাদের দোকানের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে কত খেটে-খাওয়া পরিবার যে আজ পথে বসেছে, স্বাভাবিক জীবনযাপন উচ্ছন্নে গেছে, তার খোঁজ এ সমাজে কেউ রাখে না। বর্তমানে অধিকাংশ খরিদ্দারই চলমান রাজনৈতিক সমাজের পাতি-নেতা, ছিঁচকে নেতা বা মাঠ পর্যায়ের নেতা। এদের নেশা কিনতে নগদ টাকার জোগান পেতে বেশি অসুবিধে হয় না। বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং দোকানের নিয়মিত আদায়কৃত চাঁদার অংশ এদের পকেটে আসে। তাছাড়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মসূচি, যেমন– 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচির মতো অসংখ্য কর্মসূচির রূপান্তরিত টাকার একটা বিরাট অংশ ভাগ হয়ে এদের নেতার মাধ্যমে এরা পকেটজাত করছে এবং পরিণামে তা বাণ্ঠার দরবারে খরচ করছে। থানা ও জেলা পর্যায়ের নেশাখোর নেতারা অন্য বিশ্বস্ত মাধ্যম দিয়ে 'মাল-পানি' সংগ্রহ করে, এরা অনেক সময়

ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। বাস-ট্রাক-টেম্পোর ড্রাইভার এবং মালিকপক্ষের একটা বড় অংশ বাণ্ঠার বাঁধা খরিদ্দার। এদের অর্থ জোগানে কোনো সমস্যা নেই। এ শ্রেণির খরিদ্দারদের নীতিমালা হলো, 'কাঁচা টাকা আয় করো, আর দিতে থাকো'। বাজারের ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বাণ্ঠা-মেলার সংস্পর্শে এসে দিনে দিনে পুঁজি হারিয়ে ফতুর হচ্ছে, দেউলে হচ্ছে।

বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে সাধারণ পরিবারের বখে-যাওয়া সন্তানদের নিয়ে। এদের কুসঙ্গের অভাব নেই। এরা ভারতীয় টিভি-চ্যানেলের ধুমধাড়াক্কা অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসছে, হিন্দি মিউজিকের তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল ফোনের গোণ্ঠী উদ্ধার করছে, বাপ-মায়ের পকেট কাটছে, প্রয়োজনে মাকে খুন করছে আর নেশা গিলছে, এ-এক জ্বলন্ত আপদ! 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' আরেক আপদ সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবারের নেশাসক্ত কর্তাদের নিয়ে। এরা তাদের স্ত্রী-সন্তানসন্ততিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। পরিবারগুলোর মূল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এদের নেশার টাকার চাহিদার কোনো সীমাপরিসীমা নেই। না আছে দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমাপরিসীমা। এ পরিবারগুলো জীবনযুদ্ধে পরাজিত, নেতিয়ে-পড়া খাঁচাবদ্ধ পাখির মতো– 'শিকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা ভাঙিতে না পারে, পাখি ছটফটাইয়া মরে, পাখি ধড়ফড়াইয়া মরে' বললে অত্যুক্তি হবে না।

এসব দুর্দশাগ্রস্ত-বিধ্বস্ত পরিবারগুলোর জীবন্মৃত পরিণতি বাণ্ঠা ত্রিভুজগং নিজ নিজ স্বার্থে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে কোনোদিন বুঝতে চায় না, বা ভবিষ্যতেও চাইবে বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে না। এখানে রক্ষকই ভক্ষকের প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া এসবই দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অংশমাত্র, যা বাণ্ঠার মতো ময়লাফেলা-নিরক্ষর সুইপারের কল্পনাতীত চিন্তা-ব্যবচ্ছেদ।

কিন্তু আজ এই পহেলা বৈশাখের আনন্দঘন রাতের মধ্যপ্রহরে গত পহেলা বৈশাখের এই একই সময়ের বেদনাবিধুর-দুঃসহ স্মৃতি বাণ্ঠার মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। তার মাথায় শুধু আসছে, মানুষ এমনও হতে পারে? মানুষের

জীবনে এমন ঘটনাও ঘটে? তার মনে একটাই বুঝ, সে তো খরিদ্দারদের সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তাদের জন্য যা করার সবই করে। প্রতিদিন যেখানে পাঁচশো কেজি মাল আনলেই তার খরিদ্দারদের চাহিদা মেটাতে পারে, সেখানে ঐ দিনও আজকের মতো বৈশাখ-পর্ব বুঝে এক হাজার কেজি মাল আগেভাগেই সংগ্রহ করে রেখেছিল। তারই-বা দোষ কোথায়? কিন্তু পরিস্থিতি এমনই পর্যায়ে চলে গেল যে, মাঝরাতে মালের টানাটানি শুরু হয়ে গেল। গত্যন্তর না পেয়ে বাণ্ঠা ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে ছিল, কিন্তু তাও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। একদল এসে বাণ্ঠাকে 'মাল-পানি' দিতে বললো। সে তার অপারগতার কথা জানালো। এক হাজার কেজিতেও সামাল দিতে পারেনি তা-ও সবিস্তারে খুলে বললো। হাতজোড় করে মাফ চাইল। তবু তারা কিছুই শুনতে চাইল না, বুঝলো না। অহেতুক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এক পর্যায়ে বাণ্ঠাকে বেশ মারধর করলো। তাতেও তাদের তৃপ্তি মিটলো না, কয়েকটা লাথি মারলো। সে তাদের পা জড়িয়ে ধরলো। তবু সে নিস্তার পেল না। তারপর তারা বাণ্ঠার ঘরবাড়ি ভাঙচুর করলো। সে নতজানু হয়ে নতিস্বীকার করলো, মিনতি করলো, তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। অবশেষে, তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘরটা বাণ্ঠার সামনে দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগলো। সে চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগলো। কেউ এগিয়ে এলো না। ওরা চলে গেল।

গতবারের মতো আজ সেই পহেলা বৈশাখের রাত, বছরপূর্তির দিন। বাণ্ঠার মনটা আজ তাই খুবই খারাপ। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তার মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, যে স্বজন হয়ে তার কাছে আসে তাকেই সে বলে, 'তোরা হামাক লাথি মারলি ক্যান? তোরা হামার ঘরটাত আগুন দিলি ক্যান?'

মে ২০১৬

গন্তব্যহীন যাত্রা

ড. এম. এইচ. রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের একজন অধ্যাপক। উদারনৈতিক, স্বাধীনচেতা, সমাজসচেতন ব্যক্তিত্ব। সমাজের উত্থান-পতন, ক্রান্তিকাল, সমূহ-টানাপোড়েন নিয়ে তিনি সবসময় ভাবনাচিন্তা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তা উল্লেখও করেন। তিনি বিবেচনাশীল, নৈতিকতাসম্পন্ন সাধারণ এক মানুষ। অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। সমাজের সাধারণ মানুষকে নিয়ে চলতে ভালোবাসেন। বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ হওয়ায় কোনো ব্যক্তি ইনিয়ে-বিনিয়ে তার দুঃখ-কষ্টের কথাগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারলেই অধ্যাপক রহমান মুক্তহস্তে পকেট উজাড় করে দেন। পরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে নিজের মনকে দগ্ধ করেন। বুড়ো বয়সে এসে একটা ব্যক্তিগত গাড়ি কিনলেও অধিকাংশ সময় তাতে চড়েন না। রিক্সা-বাসে চড়ে এখানে ওখানে যাতায়াত করেন, পথ চলেন। চলতি পথে বাদাম কিনে পথে দাঁড়িয়েই খাওয়া শুরু করে দেন। ফুটপাথের দোকানিদের সাথে চুটিয়ে গল্প জমান, সখ্য গড়েন, তাদের ঘর-সংসারের খোঁজখবর নেন; বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করেন। বাস্তবতা থেকে অর্জিত এসব জ্ঞানের আলোকে ক্লাসে এসে ছাত্রছাত্রীদের কাছে গল্প করেন, সুশিক্ষা দেন। ছাত্রছাত্রীদের সবসময় বোঝাতে চেষ্টা করেন, যে লেখাপড়ার মধ্যে সুশিক্ষা নেই, তা মূল্যহীন। সুশিক্ষাপ্রাপ্ত আদর্শবান নাগরিক ছাড়া সুষ্ঠু সমাজ ও কল্যাণরাষ্ট্র কখনোই গড়া যায় না। সত্যাশ্রয়ী নিরহঙ্কার মানুষ হওয়ায় যা বোঝেন, খোলাখুলি বলা পছন্দ করেন, জীবনের ঘোর-প্যাঁচ বোঝেন না। তিনি সংসার-উদাসীন, আত্মভোলা, ভাববাদী গোছের এক অনন্য মানুষ। জীবনদর্শন নিয়ে অনেক ভাবেন– কথা ও বক্তৃতায় তা বোঝা যায়।

অধ্যাপক রহমান মাঝেমধ্যে ঢাকার আজিমপুর-টঙ্গী রুটের বাসে যাতায়াত করেন। একটা সিটি পরিবহন আজিমপুর থেকে নিউমার্কেট-কলাবাগান-ফার্মগেট-মহাখালী হয়ে টঙ্গী পর্যন্ত যায়। উনি সাধারণত নিউমার্কেট

বাসস্টপেজ থেকে বাসে চড়েন, উত্তরায় গিয়ে নামেন। আজ বাসে চড়তেই অধ্যাপক রহমানের চোখে পড়লো বাসে সিট খালি নেই বললেই চলে। একটা ছেলে বাম পাশের একটা সিটে জানালার পাশ ঘেঁষে বসে আছে। তিনি ছেলেটার পাশের সিট খালি পেয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন। তাঁর এই বয়সে এত পথ দাঁড়িয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

পাশের সিটে বসা ছেলেটার আপদমস্তক তিনি একবার দেখে নিলেন। চুলটা দু পাশ থেকে ছেঁটে উপরের দিকে উঠানো, খাড়া-খাড়া করা। গায়ে একটা আঁটসাঁট ফুলহাতা শার্ট, খাটো ঝুল। হাত উঁচু করলেই নাভি ও কোমরসহ নিতম্বের অর্ধাংশ আলগা হয়ে যায়। পরনে জিন্সের টাইট-ফিটিং একটা প্যান্ট। প্যান্টটা কোমরে তো পরা না, যেন নাভিস্থল থেকে চার-পাঁচ ইঞ্চি নীচে নিতম্বের আধাআধি অবস্থানের উপর ঝুলছে– পড়-পড় অবস্থা, বেল্ট দিয়ে বাঁধা। জিন্সের প্যান্টের দু পাশেই হাঁটু বরাবর আবার একটু করে ছেঁড়া, সুতো বেরিয়ে আছে। চারপাশ থেকে চেঁছে থুতনির উপর নিয়ে এসে ছেঁটে ছোট করা একচিলতে ছাগলা দাড়ি, ফ্যাশন-দুরস্ত দাড়ি। হয়তো পার্শ্ববর্তী দেশের কোনো এক উঠতি নায়কের অনুকরণে এই দাড়ি। পায়ে চটি-স্যান্ডেল, যেগুলো সচরাচর টয়লেটে ব্যবহৃত হয়। এ বেশবিন্যাস বর্তমান যুবসমাজে সমধিক প্রচলিত। ছেলেটার বয়স উনিশ-বিশ হবে। হাব-ভাবে মনে হয় কোনো কলেজে কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছেলেটার দু কানের মধ্যে দুটো তার দু দিক থেকে ঢোকানো। কিছুদূর গিয়ে দুটো তার এক হয়ে শেষ প্রান্তে একটা পিন বাঁধা। পিনটা হাতে রাখা একটা মোবাইল ফোনের মধ্যে ঢোকানো। তারের মাঝামাঝি পর্যায়ে মুখ-বরাবর আরেকটা ছোট বোতামের মতো আছে। সেটার মাধ্যমে ফোনে কথা বলা যায়। ছেলেটা তাই করছে। ফোনটা বেশ দামী বলেই মনে হয়।

অধ্যাপক রহমান নিউমার্কেট স্টপেজ থেকে বাসে উঠেই লক্ষ্য করছেন যে, ছেলেটা জানালার পাশ ফিরে বসে কার সাথে যেন আস্তে আস্তে কথা বলছে, আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসছে। বোঝা যাচ্ছে, রোমান্টিক গল্প জমেছে। অধ্যাপক রহমান ওদিকে খেয়াল না-করে অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন, কলাবাগান স্টপেজে আসতে আসতেই বাস পুরোপুরি ভরে গেল। ভিতরে দাঁড়াবারও আর ঠাঁই নেই।

পথে অত্যন্ত ভিড়। যানবাহনগুলোরও এলোমেলো চলাচল। বিশৃঙ্খল অবস্থা। কেউ কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করে না, লেন মানে না। সবাই একযোগে আগে যেতে চায়। এও এক ধরনের মানসিক বিকলতা। আবার 'ধুনা যায় উজান, তো মুনা যায় ভাটি।' এ-এক আজব ট্রাফিক চলাচল, ফলে ট্রাফিক জ্যাম নিরন্তর। নিউমার্কেট থেকে পাকা এক ঘণ্টায় বাসটা ফার্মগেটে পুলিশবক্সের কাছে এসে থামলো। ফার্মগেটের ফার্মভিউ সুপার মার্কেটের এক সিডির দোকান থেকে সশব্দে বাজনার তালে তালে ধুমধাড়াক্কা একটা গান ভেসে আসছে, 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফুর্তি কর, আগামীকাল বাঁচবে কিনা বলতে পারো! হেই, দুনিয়াটা ...।'

অধ্যাপক রহমান নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করলেন, আসলে জীবনের উদ্দেশ্য কী? কেনই-বা এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব? মানুষের বেঁচে থাকা কি শুধুই খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তি করার জন্য? শুধু ভোগ এবং বংশবিস্তারই যদি মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য ইতরপ্রাণীর সাথে মানুষের আর পার্থক্য থাকে কোথায়? মানুষ যখন তার জীবন-জীবিকার উদ্দেশ্য ইতরপ্রাণীর উদ্দেশ্যের সাথে গুলিয়ে ফেলে, তখনই মানুষ ইতরপ্রাণীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এই যে পাশে-বসা ছেলেটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে একজনের সাথে কথা বলেই চলেছে, এদের কি সময়ের কোনো মূল্য নেই? এ চিত্র তো পথে-ঘাটে প্রতিনিয়ত সবখানে। এরা কি বোঝে যে, জীবনের সব-ভালোলাগা সব-বয়সে ভালো নয়?

আমাদের উঠতি যুবসমাজের অধিকাংশের জীবন শুধু প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে এমনই না-ফোটা ফুল হয়ে যাচ্ছে, যা পূর্ণতা না-পেয়ে কুঁড়িতেই পোকায় খাচ্ছে এবং আজীবন তাকে অতীত সে-ভুলের খেসারত তার অজান্তেই দিতে হচ্ছে। এজন্য মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো ছাড়াও রাষ্ট্রপরিচালকরাও কম দায়ী নয়। ফোন কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য বিক্রির জন্য অপরিণত যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে, পরিবেশকে নষ্ট করছে। উঠতি যুবসমাজের মনে সুড়সুড়ি দেয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে দিয়ে বলছে, 'রাত বারোটার পর থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত শুধু একটা নাম্বারে ফোনকল ফ্রি। কোনো কোনো কথা আছে যা একাকী নিরিবিলি বলতে হয়...' ইত্যাদি। আমরাও সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে উটপাখির মতো মুখ গুঁজে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি, আর সমাজের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলি, আত্মপ্রবঞ্চনা করি। চরিত্র-সংহারক বিভিন্ন উপকরণ ও ব্যবস্থা সহজলভ্য করে তুলি, বিকৃত রাজনীতির

যূপকাষ্ঠে বন্দি করে দেশাত্মবোধের ছবক দেওয়ার নামে সুকৌশলে চরিত্র-বিধ্বংসী আত্মকেন্দ্রিক ভাবাদর্শের মনোলোভা ট্রেনিং দিই এবং পরিশেষে, পুরো ব্যক্তিচরিত্রটাকেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বানিয়ে ফেলি।

আত্মভোলা অধ্যাপক রহমান কখন মহাখালী বাস স্টপেজ পেরিয়েছেন লক্ষ্য করেননি। বনানী স্টপেজে আসার আগেই পাশের মার্কেট থেকে ভেসে আসা আরেকটা গানে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। গানটার প্রথম কলিটা এরকম, 'আমি কি বেঁচে আছি, নাকি মরে বেঁচে আছি ...।'

অধ্যাপক রহমান নিজেকে ফিরিয়ে নিলেন, ছেলেটার দিকে আরেকবার মনোযোগ দিলেন। ফোনে তখনও পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে গল্প চলছেই। মাথায় মাঝারি করে ছাঁটা চুলগুলো খাড়া, তেলকুচকুচে কালো, আঠালো তেলে ভরপুর, যা অধ্যাপক রহমানের বাল্যস্মৃতিকে মনে করিয়ে দিল।

বদর নামে তাঁর এক বাল্যবন্ধু ছিল। ক্লাস থ্রিতে একসাথে পড়তো। সে-সময় দেশে সরষে এবং মসনের খুব চাষ হতো। কোনো কোনো অঞ্চলে মসনেকে আবার তিসিও বলে থাকে। বর্তমানে মসনের আবাদ দেশ থেকে উঠে গেছে বললেই চলে। তখন গ্রামের লোকেরা সরষের তেল কিংবা মসনের তেল রান্নার কাজে এবং মাথায় মাখার কাজে ব্যবহার করতো। মসনের তেল প্রকৃতিগতভাবেই খুব আঠালো। বদর মসনের তেল মাথায় যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহার করতো। পরিমাণটা বেশি হওয়ায় দু কানের পাশ বেয়ে চুঁইয়ে কাঁধ পর্যন্ত চলে আসতো। শার্টের কলার তেলে ভিজে একাকার হয়ে যেত। চুলগুলো ছিল তেল-চটচটে। আঠালো তেলে একটা চুল অন্যটার সাথে জট পাকিয়ে মোটা হয়ে যেত। এসব স্মৃতি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

অধ্যাপক রহমান ভাবছেন, এ-দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা একটু সতর্ক হলেই হারিয়ে যাওয়া মসনের আবাদ বাড়িয়ে মসনের চটচটে আঠালো তেলের গুণাগুণকে আবার এ-দেশের ফ্যাশনদুরস্ত যুবসমাজের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন। এতে বিদেশী আঠালো এ-তেলের আমদানিও বন্ধ হয়ে যায়, আবার বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হয়, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটে। শুধু তেলটার নামকরণের সময় একটা আধুনিক শব্দ ব্যবহার করলেই হয় এবং কোনো এক উঠতি বয়সী জনপ্রিয় তারকাকে দিয়ে তেলটা একদিন মাখিয়ে উদ্বোধন করলেই

বিজ্ঞাপনের কাজ হয়, বাজারও মাত করা যায়। এটা যেহেতু সব-সম্ভবের দেশ, ফলে এটা সম্ভব।

হাঁটুর দিকে তাকাতেই আবারও সেই হাঁটু-ছেঁড়া প্যান্টের দিকে অধ্যাপক রহমানের নজর গেল। তিনি শুনেছেন, বাজারে হাঁটু-ছেঁড়া প্যান্টের দাম অন্যান্য প্যান্টের তুলনায় একটু বেশি। আর হবেই তো! একটা ভালো আনকোরা প্যান্টকে হাঁটু বরাবর ছিঁড়ে সুতো বের করতে গেলে তো অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ দিতেই হয়। তাদের আবার অতিরিক্ত মজুরিও দিতে হয়। এজন্য দাম তো একটু বাড়তেই পারে।

অধ্যাপক রহমান ভাবছেন, আমাদের যুবসমাজের এ আবার কেমন আত্মোপলব্ধিহীন, মূল্যবোধহীন, ব্যক্তিত্বহীন অভিরুচি, যে সমাজব্যবস্থায় স্বকীয়তা বলতে কিছু নেই! অন্য একজন বিকৃত-রুচিবোধের পরিচায়ক একটা নতুন কিছু করলেই বাছবিচার না করে নিজেও তাই করতে থাকে। এ কেমন মনোজাগতিক বৈকল্যভরা আত্মবিনাশী আত্মসমর্পণ!

বনানী রেলগেট পার হতে না-হতেই সহসা ছেলেটার অন্য একটা ফোন পকেটের মধ্যে বেজে উঠলো। সাথে সাথে ছেলেটার কণ্ঠও উচ্চকিত হলো। ছেলেটা স্থানীয় ভাষায় বার বার অনেক কথা বলে তার মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, বোঝানোর চেষ্টা করছে, বোধ্য ভাষায় যার সারসংক্ষেপ এরকম– না, মা, এই যে আমি আসছি, সায়েদাবাদ প্রায় পার হয়ে গেছি, এই তো নারায়ণগঞ্জের কাছে চলে এসেছি। আর বেশিক্ষণ লাগবে না, একটু অপেক্ষা করো। আমি মিথ্যে বলছিনে, এই তো প্রায় চলে এসেছি, ইত্যাদি। মনে হচ্ছে, মা খুব উদ্বিগ্ন, ছেলের কথা বিশ্বাস করতে চাচ্ছেন না, ছেলের কথার প্রতি মার কোনো আস্থা নেই। মা ছেলেকে সত্য করে বলতে বলছে, ছেলের বাসায় ফিরতে আর কত দেরী হবে। মা অপেক্ষায় আছে। ছেলেও নাছোড়বান্দা। উচ্চস্বরে বার বার মাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, সে নারায়ণগঞ্জের কাছে চলে এসেছে, আর দেরী হবে না, বাসায় পৌঁছে যাবে।

তাঁর পাশের সিটে বসে একটা ছেলের তার মায়ের সাথে এহেন সর্বৈব মিথ্যে বলাটা অধ্যাপক রহমান কোনোভাবেই সহ্য করতে পারলেন না। বাসটা এতক্ষণে বিশ্বরোডের মোড়ে চলে এসেছে। অধ্যাপক রহমান সিট থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন, চিৎকার করে বলতে থাকলেন– ড্রাইভার সাহেব, ড্রাইভার

সাহেব বাস থামান, বাস থামান। আমি উত্তরা যাব, নারায়ণগঞ্জ যাব না। আমাকে এখানে নামিয়ে দিন, আমি নারায়ণগঞ্জ যাব না।

পেছনের সিট থেকে একজন বলে উঠলেন– এই যে মুরব্বি, বাস তো আপনাকে উত্তরাতেই নামিয়ে টঙ্গী যাবে, এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? ধৈর্য ধরুন।

অধ্যাপক রহমান ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে বেশ জোরে জোরে বাসভর্তি যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে চলেছেন– কীভাবে বুঝবো যে বাস উত্তরা হয়ে টঙ্গী যাবে? এই যে, এখনো মুখ চিপলে দুধ বেরোয় এমন একটা ছেলে প্রকাশ্যে আপনাদের সবার সামনে জোরে জোরে তার মাকে বার বার বলে চলেছে যে, সে প্রায় নারায়ণগঞ্জ চলে এসেছে। আপনারা এতগুলো লোক তা কান পেতে শুনছেন, অথচ ছেলেটার কথায় কেউ কোনো প্রতিবাদ করছেন না। আমরা এ কোন আত্মপ্রবঞ্চিত, আত্মপ্রতারিত সমাজে বসবাস করছি? এভাবে প্রকাশ্যে মিথ্যাচার কীভাবে কতক্ষণ সহ্য করা যায়? সমাজের এ কোন নৈরাজ্যবাদী রূপ আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দেখতে হচ্ছে? সমাজকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?

বাসভর্তি সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেলেন, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। ছেলেটাও কখন যেন তার মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিয়েছে।

এতক্ষণে বাস এয়ারপোর্ট স্টপেজে এসে থেমেছে। ছেলেটা সহসাই সিট থেকে উঠে মাথা নিচু করে মলিন মুখে নামার উদ্দেশ্যে বাসের দরজার দিকে চলে গেল। নামার সময় ছেলেটা হাত উঁচু করে মাথা বরাবর বাসের রড ধরতে ধরতে যাওয়াতে পিছনের কোমর থেকে নিতম্বের অর্ধাংশ অর্ধপরিস্ফুট অন্তর্বাসসহ অর্ধোলঙ্গ হয়ে গেল। এ রূপ যেন আমাদের নব্য-জাগরিত, দিগ্‌ভ্রান্ত, গন্তব্যভ্রষ্ট সমাজের প্রকাশ্য রূপ। পিছনের কেউ কেউ সেদিকে একবার দৃষ্টি দিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো। অন্যরা ছেলেটার প্রস্থানের পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

এপ্রিল ২০১৬

অন্তহীন নৈরাজ্যে বসবাস

একটা জিনিস সুজন মাস্টার শত চেষ্টা করেও কখনো এড়িয়ে চলতে পারেননি, বার বার তাঁকে ব্যর্থতার গ্লানি সইতে হয়েছে। তিনি তার কপালকে সাথে রাখতে চান না। তিনি যেদিকেই যান, কপালও তাঁর সাথে সাথে যায়– এ কেমন আজব ব্যবস্থা সৃষ্টিজগতের। কপালকে যদি শরীর থেকে আলাদা করা যেত! কপালকে যদি এ-দেশের কোনো এক আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে বদল করা যেত! কতই-না ভালো হত! কী কপাল দোষেই-না তিনি এ-দেশে জন্মেছিলেন! এ-দেশে না জন্মালে তো আর দেশের প্রতি এত ভালোবাসা-মমত্ববোধের প্রশ্নই উঠতো না।

এসব কথা ভাবতেই তাঁর মনের পর্দায় একতারা হাতে লালনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনি গেয়েছেন, 'কপালের নাম গোপালচন্দ্র, কপালের নাম গুয়ে-গোবরে– সকলি কপালে করে ...।' লালনের এ গান মেনে নিতে সুজন মাস্টারের কষ্ট হয়, তবু তিনি তা মেনে নিয়েছেন– মনের কাছে হার মেনেছেন। মেনে না নিয়ে তাঁর কোনো পথ নেই। মনের সান্ত্বনা খোঁজার, মনকে প্রবোধ দেয়ার এটা একটা পথ। এ-জনপদে বাস করে এ-পথকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। জীবনের কঠোর বাস্তবতায় আজ তাঁকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অনেক অমূলক কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। তিনি অনেকবার বিশাল সমুদ্রের অসীম জলরাশির পাশে গিয়ে নিজের সসীম জীবনের সমীকরণ মিলিয়েছেন। তাকিয়ে দেখেছেন, সমুদ্রের অবারিত ঢেউরাশি কূলে এসে আছড়ে পড়ছে, ঢেউয়ের তালে তালে অথৈ জলরাশি আলোড়িত হচ্ছে, সমুদ্রের নিঃসীম বুকে টলমল করছে। তিনি জীবনের সাথে সমুদ্রের ঢেউরাশির সাদৃশ্য খুঁজেছেন, কবিতার ভাষায় লিখেছেন, 'তাকিয়ে দেখি সমুদ্রের থৈ-থৈ জলে, যেন আমার

জীবনডিঙি ভাসছে প্রকৃতির অগণিত ঘটনার তালে তালে।' তাঁর এসব দার্শনিক কথাবার্তা এ-যুগের ভোগবাদী ভাবধারায় অচল। বাস্তবতা হলো, তাঁর জীবনডিঙি ভাসতে ভাসতে আজ এই শেষ বিকেলে এসে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে।

আজন্ম থানার বারান্দায় যাননি তিনি, আদালতের কাঠগড়া কেন– দোরগোড়াও তিনি মাড়াননি; কোনো উকিলের দ্বারস্থ হওয়া লাগেনি। চলার পথে দূর থেকে থানা ও আদালতের সাইনবোর্ড অনেকবার দেখেছেন। আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে-থাকা অসংখ্য মানুষজনের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। ভুক্তভোগীর নীরব কান্না, আহাজারি, নিরবচ্ছিন্ন ভোগান্তি তাঁর কৌতূহলী মন দূর থেকে ভেবে সম্যক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসবের অনেক কিছু পেপার-পত্রিকায় পড়ে, দূরদর্শনের পর্দায় দেখে জীবনের চলতি সময়ের ভয়াবহতা অনেকটাই আঁচ করতে পেরেছেন। ছাপার অক্ষরে প্রকাশনার প্রতি, দূরদর্শনের চলন্ত ছবির প্রতি মনের অজান্তেই অনেকটা আস্থার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। আবার সমাজের পরিচিতজন, বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞতার বাস্তব বর্ণনায় আজকালকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অতিরঞ্জিত কিংবা মনগড়া খবরাখবর এবং চলন্ত ছবির প্রতি দিনে দিনে অন্তরে বেশ অনেকটা ঘুণ ধরেছে, বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ফলে এ-দেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা, নৈতিক অবক্ষয় এবং বিদ্যমান ধসনামা-মূল্যবোধ নিয়ে দোটানার মধ্যে পড়েছেন। এবার তাঁর নিজ জীবনের বাস্তবতার কষ্টিপাথরে সবকিছু তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে যাচাই করতে চান। জীবনের এ প্রান্তসীমায় ভাটার টানে ফিরে যাবার আগে, শখের এ মাতৃভূমির হালনাগাদ বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন তাঁর বড় দরকার।

রোজার মাস। সকালে ঘুম থেকে উঠতে পরিবারের সবারই বেশ দেরী হয়ে গেল। সুজন মাস্টার ও তাঁর স্ত্রী বাসায় ছেলে-মেয়েদের রেখে সকাল দশটা না-বাজতেই ঈদের কেনাকাটায় বেরিয়ে গেলেন। সুজন মাস্টার মাত্র এক সপ্তাহ আগে পেশাগত দায়িত্বের কারণে বেশ ক মাস বিদেশে থেকে দেশে ফিরেছেন। আত্মীয়-স্বজনসহ অনেককেই এই ঈদে নিজ হাতে করে কিছু না-কিছু দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন। তাই এ কেনাকাটা।

কেনাকাটা শেষে তিনি নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে রওনা হলেন। স্ত্রী ব্যাংকে মেয়ের স্কুলের বেতন দিয়ে এবং কাজের মেয়ে পন্নীর মাকে ঈদের কেনাকাটার জন্য টাকা পাঠিয়ে বাসায় ফিরবেন বলে জানালেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে সুজন মাস্টারের আজ বেশ দেরী হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর স্ত্রীর ফোন পেলেন। স্ত্রী জানালেন, বড় মেয়ে তাকে ফোন করে এইমাত্র জানিয়েছে যে, পন্নীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো বিল্ডিংয়ে খোঁজা হয়েছে, কোথাও নেই। সুজন মাস্টার ও তার স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় পন্নী রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বাসার দরজাও সে-ই বন্ধ করেছিল। কিছুক্ষণ পর-পর বাসার বারান্দায় যাচ্ছিল, বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও ছিল। একসময় কাপড় নাড়ার নাম করে বালতি হাতে ছাদে যায়। আর ফিরে আসেনি।

বড় মেয়ে তার ঘরে ছোট বোনটাকে পড়াচ্ছিল। অনেকক্ষণ কেটে গেছে পন্নীর খোঁজ করেনি। এখন খুঁজতে গিয়ে দেখে, ছাদে পন্নী নেই। পুরো বিল্ডিং খোঁজা হয়েছে, কোথাও নেই। পন্নী মাঝেমধ্যে বিল্ডিংয়ের অন্য বাসায় গিয়ে বসে বসে টিভি দেখে। তাই বাসায় না-পাওয়া গেলেও অন্য বাসায় পাওয়া যায়।

এ বিল্ডিংয়ের প্রতিটা বাসায় পন্নীর অবাধ বিচরণ। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে সে এ-বাসায় আছে। সুজন মাস্টারের পরিবার পন্নীকে খুব বিশ্বাস করে। সুজন মাস্টার তাঁর স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যেতে বললেন। ছেলেকে সাথে নিয়ে আশপাশের বাড়িতে খোঁজ করতে বললেন। পাশের বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে খুঁজে দেখতে বললেন।

স্ত্রী ছেলেকে সাথে করে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করে না-পেয়ে আবার ফোনে সুজন মাস্টারকে জানালেন। তিনি এবার ছেলেকে সাথে নিয়ে স্ত্রীকে বাস টার্মিনালে গিয়ে পন্নীর বাড়িমুখী বাসগুলো খুঁজে দেখতে বললেন। নিজে অফিস ছেড়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। রোজার মাস, তাছাড়া শেষ-দুপুরের রোদে প্রচণ্ড তাপ, পথে যানজট। তাঁর বাসায় পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ইতোমধ্যেই স্ত্রী বাস টার্মিনাল থেকে জানিয়েছেন যে, পন্নীকে সেখানেও পাওয়া যায়নি। এবার তিনি স্ত্রীকে ফোনের মাধ্যমে বিষয়টি পন্নীর মাকে জানানোর জন্য বললেন। পন্নীর মা উদ্বিগ্নতা দেখালো। কাঁদো কাঁদো সুরে পাশের বাসায় বেশি করে খোঁজাখুঁজি করতে বললো। কথার এক ফাঁকে পন্নীর মা জিজ্ঞেস

করলো– আপা, চারদিন আগে কি পন্নীকে মেরে মুখ ও কপাল কেটে দিয়েছিলেন? আবার বললো– আপনারা বলুন তো, আমার মেয়েকে কি চারদিন আগেই মেরে ফেলেছেন? আরোও বললো– আমার মেয়েকে মেরে ফেলে আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কি ঈদ-কেনাকাটার নামে টাকা পাঠিয়েছেন?

এসব কথায় সুজন মাস্টার ও তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ দানা বাঁধলো। এতটা দিন ধরে এই মহিলার সাথে কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে, কিন্তু এ-ধরনের ভাষা তার মুখ থেকে কখনো শোনেননি। তাছাড়া সে যদি বোঝেই যে, চারদিন আগেই তার মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে, তবে এ-কদিন তো ঐ মহিলার চুপ করে বসে থাকার কথা নয়। তাহলে কি কোনো লোক এসব খবর আজই ঢাকা থেকে চালান দিচ্ছে? তাহলে কি এর আগে থেকেও কোনো লোক পন্নীর বাপ-মাকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে আসছে? এ বাড়িতে না রাখতে চাইলে, এই তো এক সপ্তাহের মধ্যেই পন্নী ঈদ করতে বাড়িতে যাবে, তাকে আর না-আসতে দিলেই হলো, কিন্তু ঠিক বাড়ি যাবার আগ-মুহূর্তে তার এ হারিয়ে যাওয়ার কারণ কী?

বাড়ির আশপাশে সবার মধ্যেই বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। এলাকার সমিতির সেক্রেটারি সুজন মাস্টারকে বিষয়টি নিয়ে থানায় একটা সাধারণ ডাইরি করার পরামর্শ দিলেন। ডাইরি করতে যাবার পথে প্রতিবেশী একজন তাঁকে বললেন, ডাইরি করার সময় যেন উল্লেখ করা হয় যে, মেয়েটা বাসা থেকে চলে যাবার সময় কিছু টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। থানায় ডাইরি করার সময়ও যিনি ডাইরি লিখছিলেন, তিনি বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, চলে যাওয়া ছাড়া লেখার আরো কিছু আছে কিনা? পাশ থেকে অপরিচিত একজন বলে উঠলেন– কিছু নগদ টাকা নিয়ে গেছে বলে লিখে দিন। ডাইরি লেখক বললেন– আচ্ছা, লিখে দিচ্ছি।

সুজন মাস্টার বাধা দিলেন। তিনি বললেন– এসব মিথ্যা কথা লিখলে আমি সাধারণ ডাইরির নীচে সই করতে পারবো না। আমি যে কথা কয়টি বলেছি, শুধু সেটুকুই লিখুন। কোনোভাবেই সত্যকে বিকৃত করা কিংবা কোনো মিথ্যা বিবৃতি দেয়া সম্ভব নয়।

সুজন মাস্টারের ভাবোদয় হলো, তাহলে কি নির্ভেজাল মিথ্যা দিয়েই এ-দেশে আইন ও বিচারজগৎ শুরু? ডাইরিতে কি তাহলে মনমতো যে-কোনো কিছু লেখা যায়? কিন্তু কোনো শিক্ষকের পক্ষে কি কোনো মিথ্যা বিবৃতির নীচে জ্ঞাতসারে সই করা সম্ভব?

তিনি ডাইরি শেষে বাসায় ফিরলেন। কাজের মেয়ে হারানোর আকস্মিক ঘটনায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। খোঁজাখুঁজি চলতে থাকলো।

পন্নী গরিবের ঘরের মেয়ে। চার ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বয়স আনুমানিক চৌদ্দ। একটু বেটে গড়নের ও স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় বয়সটা তেমন বোঝা যায় না। সাড়ে-তিন বছর আগে এ বাসায় এসেছে। তাদের ঐ একই গ্রামের তামান্না এ বাসায় চার বছর কাজ করে গেছে। বিয়ে দেয়ার জন্য তার মা তাকে নিয়ে যাওয়ায় তামান্নার মা পন্নীর মাকে বুঝিয়ে পন্নীকে এ বাসায় দিয়েছিল। এর আগেও ঐ এলাকার বেশ ক জন মেয়ে প্রায় আটাশ বছর ধরে এ বাসায় কাজ করেছে। কোনোদিন কোনো অসুবিধে হয়নি। তাদের প্রত্যেকের সাথে সুজন মাস্টারের পরিবারের আজও যোগাযোগ আছে। পন্নীর বাপ উড়নচণ্ডে, সামাজিক টাউট– ধূর্ত ও লোভী প্রকৃতির গরিব লোক। এ পর্যন্ত চার-চারটে বিয়ে করেছে। পন্নীর মা ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করে না। সদ্য-বিয়ে-করা স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও থাকে। পন্নীর মা তার দ্বিতীয় স্ত্রী। সুজন মাস্টারের পরিবার পন্নীর বাপকে চেনে না, কখনও দেখেনি। তিনি অসহায়-গরিব এ পন্নীর পরিবারকে অকাতরে সাহায্য করেন। মাঝে মধ্যেই শোনা যায়, পন্নীর মা এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে গেলেই পন্নীর বাপ সজ্জন সেজে এসে পন্নীর মাকে ফুসলিয়ে সে টাকাটা হস্তগত করে, তারপর সটকে পড়ে। পন্নীর মা তার এ দুরবস্থার কথা, কষ্টের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে সুজন মাস্টারের স্ত্রীর কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করে।

সুজন মাস্টার এর আগেও এ-বয়সী মেয়েদের বাসায় রাখতে তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করেছেন, বরং বয়স্ক মহিলাদের ফুল-টাইম রাখতে বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এ-কথায় কর্ণপাত করেননি। স্ত্রীর সোজা-সাপটা বক্তব্য হচ্ছে– গার্মেন্টস হওয়াতে

বয়সী কাজের লোক ফুল-টাইম পাওয়া কঠিন। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখাও কঠিন। টাকা নিয়ে গেলে দোকানে সোনা সহজেই মেলা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বস্ত কাজের মেয়ে পাওয়া বর্তমানে কঠিন। তাই অল্প-বয়স্ক মেয়ের অনেক উৎপাত সহ্য করেও তাকে হাতের লাঠি হিসেবে বাসায় রাখতে হয়।

এভাবেই তো আটাশটা বছর কেটে যাচ্ছে। একটা মেয়ে নিয়ে আসে, কাজ শেখে, কাজ করে, দিনে দিনে বড় হয়। বিয়ে হলে চলে যায়। সুজন মাস্টারের পরিবার চলে-যাওয়া মেয়েদের আজও অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করে। চলে গেলেও সম্পর্কটা রয়ে যায়। কিন্তু যুগ তো বদলেছে, সামাজিক অস্থিরতা বেড়েছে, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমেছে– এসব সুজন মাস্টারের স্ত্রী বিবেচনায় আনতে নারাজ। অনন্যোপায় হয়ে তিনি মাস্টারি অভ্যাসের কারণে পন্নীকে বইপত্র কিনে এনে দিয়েছেন। সন্ধ্যার পর কখনো সুজন মাস্টার, কখনো তাঁর স্ত্রী, কখনো-বা তাঁর বড় মেয়ে পন্নীকে পড়ান, হাতের লেখা শেখান, সাধ্যমতো স্নেহ-মমতা দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করেন।

আট মাস আগে পন্নী একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল। টয়লেট থেকে খারাপ ময়লা পলিথিনে ভরে নিয়ে গিয়ে পিছনের বাসার এক রুমের মধ্যে ছুড়ে মেরেছিল। ঐ বাসাতে মাঝে-মধ্যেই নাকি পন্নী কিছু না-কিছু ছুড়ে মারতো। তারা অনেক পাহারা দিয়ে ওকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল। এ ক্ষেত্রে কেন এটা-ওটা ছুড়ে মারতো এ-প্রশ্ন সুজন মাস্টারের কাছে অবান্তর। উঠতি বয়সের চঞ্চল মনের দুরন্ত কিশোরী। আবদ্ধ পরবাসী জীবন। কখন কোনটা করে বসে কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ঐ বাসার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে বিষয়টা এলাকার সমিতিতে জানিয়েছিলেন। সমিতির লোকজন সুজন মাস্টারের সম্মানের দিকে তাকিয়ে তেমন কিছু বলেননি। শুধু ঐ বিল্ডিংয়েরই আরেকজনকে দিয়ে ঘটনাটা সুজন মাস্টারের বাসায় জানিয়েছিলেন। পিছনের বাসার এক লোক এসে পন্নীকে নিয়ে গিয়ে ওসব ময়লা পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছিল। এতে সুজন মাস্টারের পরিবার সমাজের কাছে অসম্মানিত বোধ করেছিল।

সুজন মাস্টারের স্ত্রী ছাদে উঠে পাশাপাশি অন্যান্য বাসায় বসবাসরত মহিলাদের কাছে ঘটনা খুলে বলেছিল। এ সময় পন্নী ওখানে উপস্থিত হলে

সবার সামনে ছাদে তাকে মারধর করেছিল, চুল ধরে ঝাঁকিয়েছিল। পন্নীর মাকে ফোন করে মেয়ের অপকীর্তির কথা বলেছিল এবং মেয়েকে ফেরত নিয়ে যেতে বলেছিল। সুজন মাস্টার তখন দেশের বাইরে ছিলেন। স্ত্রীর কাছে এসব কথা ফোনের মাধ্যমে শুনে ওকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সুজন মাস্টারের স্ত্রী সাথে পাঠানোর মতো কোনো লোক না-পেয়ে পন্নীর মাকে মেয়েকে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল। পন্নীর মা অনুরোধের সুরে বলেছিল– আপা, এখন মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেবেন না, আমি খুব অসুবিধায় পড়ে যাব। আপনার নিজের মেয়ে কোনো খারাপ কাজ করলে কি পাঠিয়ে দিতে পারতেন?

পন্নীর মায়ের অনুনয়-বিনয়ে সুজন মাস্টারের স্ত্রীর মনটা নরম হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত নেয় যে, এবার সুজন মাস্টার দেশে ফিরলে ঈদে বাড়িতে যাবার সময় পন্নীকে বাড়িতে পাঠিয়ে আর আনা হবে না। ইতোমধ্যে সুজন মাস্টার দেশে ফিরেছেন। কদিন পরই ঈদে সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে যাবার কথা আছে, তার আগেই পন্নীর অকস্মাৎ এ অন্তর্ধান।

বেশ রাত পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চললো। সুজন মাস্টারের পরিবারের সবাই খুব উদ্বিগ্ন। রাত সাড়ে-নটার দিকে পন্নীর বাপ পরিচয়ে একটা ফোন এলো। ফোনটা সুজন মাস্টারের স্ত্রী ধরার পর সুজন মাস্টারকে দিল। পন্নীর বাপের একটা কথা– আপা, আমি পন্নীর বাপ, মণিকে একটু দেন তো, আমি তার সাথে কথা বলবো।

দীর্ঘ সাড়ে-তিনটা বছর যাকে দেখা যায়নি, এ বাড়ির কেউ যাকে চেনেও না, কখনো ফোন করেনি, হঠাৎ আজই তার মেয়ের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে কেন– বিষয়টাতে সবার মনে খটকা লাগলো। সুজন মাস্টার তাকে বললেন– কেন, আপনি কি জানেন না যে, পন্নী আজ বাসা থেকে কাউকে না জানিয়ে চলে গেছে? পন্নীর মাকে তো সব খবর দেয়া হয়েছে।

পন্নীর বাপ বললো– কই, আমি তো এসব কিছু জানিনে।

ইতোমধ্যেই বিল্ডিংয়ের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, দোতলার এক মেয়ের কাছ থেকে পন্নী বাইরের গেটের চাবি নিয়েছিল। ঐ একই সময়

নীচতলার এক ভদ্রলোক গেট খোলা অবস্থায় পন্নীকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। তিনতলার কাজের বুয়া ঐ সময়ের কিছু আগে ছাদে দাঁড়িয়ে পন্নীকে পাশের বাসার পাঁচতলার এক ভাড়াটে মহিলার সাথে কথা বলতে দেখেছে। বিল্ডিংয়ের আশপাশের পরিবারের সবারই একই কথা, পন্নীকে সব সময় ঐ মহিলার সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলতে দেখা যেত এবং ঐদিনও যাবার আগে তার সাথেই কথা বলতে দেখা গেছে। সুতরাং পন্নী কোথায় গেছে তা ঐ মহিলা জানে, কিংবা মহিলাই তাকে সরিয়েছে। কেউ কেউ আগে থেকেই মহিলার অসংলগ্ন কথাবার্তায় তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতো। মহিলা একবার বলে ব্যাংকে চাকরি করে, আবার কখনো বলে এনজিওতে, কিন্তু চলাফেরা ও অফিস সময়ের সাথে কথার মিল খায় না। গতিবিধি সন্দেহের উদ্রেক করে।

রাত পার হয়ে গেল। সকালে ফোন করে জানা গেল, পন্নী তখনও বাড়িতে পৌঁছায়নি। বাড়িতে কান্নাকাটি চলছে। একদিন পর পন্নীর বাপ গ্রামের আরো দুজন লোক সাথে নিয়ে সুজন মাস্টারের বাসায় হাজির। দুজন লোকই চেয়ারম্যানের লোক বলে নিজেদের পরিচয় দিল। পন্নীর বাপসহ সবার দাবি– আপনার বাসা থেকেই যেহেতু পন্নী হারিয়েছে, আপনাকেই তাকে খুঁজে বের করে দিতে হবে। আপনাকেই বলতে হবে পন্নীকে কোথায় রেখেছেন।

বিভিন্নজনের ফেসবুকে পন্নীর ছবি পোস্ট করে হারানো খবর প্রচার করা হলো। পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো। আরো কয়েক দিন কেটে গেল। একদিন ঐ অঞ্চলের চেয়ারম্যানের বড়ভাই পরিচয় দিয়ে ফোনে একজন বললেন– আপনারা ঢাকা থেকে এ-এলাকায় আসুন, অথবা এ-এলাকায় আপনাদের কোনো আত্মীয় থাকলে তাদেরকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলুন, আমি বিষয়টা মিটমাট করে দেব। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, মেয়েটার প্রতি প্রতিনিয়ত অত্যাচার করা হতো। হয়তো মারতে মারতে মেয়েটা এক সময় মরে গেছে। এসব কেস মীমাংসা করতে গেলে বেশ কিছু টাকা খরচা হবে। আর শুনলাম যে, মাস্টার সাহেব তো অনেক দিন ধরে বিদেশে থাকেন। আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না।

সুজন মাস্টারের মাথায় প্রশ্ন এলো– যাকে কখনো মারধর করা হয় না, তার প্রমাণ চেয়ারম্যানের বড় ভাইয়ের কাছে যাবে কী করে? আজব ব্যাপার!

এক সপ্তাহ পর থানা থেকে পুলিশ নিয়ে, সাথে গ্রামের আরো দুজন বুঝমান লোক নিয়ে পন্নীর বাপ সুজন মাস্টারের বাড়িতে হাজির। তিনি ঐ সময় বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর ছেলে ও পরিবারের সদস্যদের সাথে পুলিশের অকথ্য বচন শুরু হয়ে গেল। অনেক হম্বিতম্বির মধ্যে স্ত্রীর ফোন পেয়ে তিনি বাসায় এলেন। ন্যায় ও সত্যের প্রতিভূ সুজন মাস্টারের মনোবলই বড় বল। তিনি অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করলেন না। পুলিশ পন্নীর দোতলা থেকে চাবি নেয়া এবং নীচতলার ঐ ভদ্রলোকের পন্নীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার বিবরণ নিয়ে ঐ দিনের মতো বিদায় নিল।

দুদিন পর পন্নীর বাপের এলাকার তিনজন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সুজন মাস্টারের সাথে কথা বলতে চান বলে জানালো। তারা ঢাকায় এক দলীয়-দাওয়াতে এসেছিল এবং পন্নীর বাপের অনুরোধে থানায় এসে ঘটনাটা শুনেছে। তাদের একটাই কথা, যেহেতু সুজন মাস্টারের বাসা থেকে পন্নী হারিয়েছে, পন্নী কোথায় আছে তা তাঁকেই খুঁজে বের করে দিতে হবে। তবে থানায় গিয়ে তারা যেটুকু বুঝতে পেরেছে তা হলো, ইতোমধ্যেই সুজন মাস্টার থানাকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন। কিন্তু সোজা আঙুলে ঘি না-উঠলে আঙুল কীভাবে বাঁকা করতে হয় তা তারা জানে। ক্ষমতাসীন দলের অনেক রাঘব-বোয়ালদের সাথে তাদের দহরম-মহরম আছে। তাদের সাথে কথা বলে 'ঘাড়বাঁকা' মাস্টার সাহেবকে কীভাবে জেলে ঢোকাতে হয় তা তারা দেখবে। থানা কেস না নিলে কোর্টে সরাসরি কেস করা যায়– সেটাও তাদের অজানা নয়। তারা জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় রাজনীতি করে।

তিনজন ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মধ্যে দুজনকে নির্ভেজাল পলিটিক্যাল-টাউট বলে সুজন মাস্টারের মনে হলো। তিনি জোর গলায় বললেন– পন্নী কোথায় আছে তা ঐ পাঁচতলার মহিলা এবং পন্নীর বাপ নিজেই জানে। আপনারা জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারাই পন্নীর বর্তমান ঠিকানা দিতে পারবে।

তারপর নিজের মনে ভাবলেন– টাকা দিলেই সব মিটমাট হয়ে যায়, আর না-দিতে চাইলেই যত কেস-কাটরার ভয়, জেল জরিমানা; এটাকে আপনারা মগের মুল্লুক বানিয়েছেন কেন? জোর যার মুল্লুক তার– এটা মানা সম্ভব নয়।

সুজন মাস্টারের এখন ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। স্থানীয় সমিতির লোকজন এসে এক সময় পাশের বাসার পাঁচতলার ঐ মহিলা ও তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাসার মালিককে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচতলার ঐ স্বামী-স্ত্রীসহ থাকতে বললেন। সমিতির লোকজন এলেন। বাসায় এসে দেখলেন, ঐ অঞ্চলের গার্মেন্টসের ঝুট-ব্যবসার বেশ কিছু 'স্বনামধন্য' সন্ত্রাসীসহ চলতি রাজনৈতিক দলের 'নামকরা' সন্ত্রাসীদের বেশ ক জনকে বাসায় এনে আগেই বসিয়ে রাখা হয়েছে। সমিতির লোকজন ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে সমিতির কেউ কেউ কেটে পড়লেন এই ভেবে যে, কিসের সমাজ! কিসের দায়িত্ববোধ! 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। তাই 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।' অবশিষ্ট লোকজনের সামনে, সন্ত্রাসীদের উপস্থিতিতে ঐ মহিলা ও তার স্বামী সুজন মাস্টারকে মনমতো গালাগালি করলো, হুমকি দিল এবং উগ্র ভাষায় বক্তব্য দিল, 'ঐ মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন, পন্নীকে কোথায় রেখেছে। হয়তো মেরে গুম করে ফেলেছে, একটু চাপ দিলেই লাশ বের হয়ে আসবে।'

প্রতিবেশী ও মহল্লার মানুষজন সন্ত্রাসীদের হুঙ্কারে থরহরি কম্পমান। কোথায় আইন বিভাগ! কোথায় সুষ্ঠু বিচার! কোথায় সত্য! রাজনীতিবিদদের গৃহপালিত সন্ত্রাসীদের হুঙ্কারে সত্য লেজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকে গেল। এ-দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা যা বলবে এটাই আইন– এটাই চিরসত্য। থানাকে জানিয়েও কোনো লাভ হলো না। মনে হলো, থানাকেও চাকরি বাঁচানোর তাগিদে রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের আজ্ঞাবাহী হয়ে চলতে হয়। জিডি করে বোঝা গেল তারা বলতে চায়, 'আগে মরো, তারপর বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করা যাবে। মরার আগে তো বেঁচেই আছেন, আবার বাঁচার প্রশ্ন কেন?' তাদের ভাবখানা এ-রকম, 'তুমি বাবা মাস্টার মানুষ, তুমি বাউ-বাতাস সমীকরণের কী বোঝো? তুমি কেন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যেতে চাচ্ছ? ওরা এত লোক রেখে তোমার পিছনে লাগলো কেন? তুমি ওদের ঠাণ্ডা রাখতে পারো না কেন? এটা তোমার অযোগ্যতা। তুমি

এ-দেশে চলার অনুপযুক্ত। তোমার দৃষ্টিতে ওরা সন্ত্রাসী, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ওরা মুক্তিকামী, উন্নয়নকামী, শান্তিকামী জনগণের স্থানীয় মহান-নেতা।'

পরে এলাকার অনেকের কাছেই শোনা গেল যে, পাশের বাসার পাঁচতলায় বসবাসরত ঐ মহিলার স্বামী গার্মেন্টসে চাকরির কথা বলে সত্য, আসলে এ এলাকার রাজনৈতিক নেতার পালিত ও আশীর্বাদপুষ্ট ঝুট-ব্যবসার 'সৌখিন সন্ত্রাসী'। রাজত্ব ওদের, ওরাই এ-রাজত্বে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

সুজন মাস্টারের জীবন নিয়ে টানাটানি। ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ। রাতদিন শুধু একটাই ভাবনা 'পাখি কখন জানি উড়ে যায়, ঐ বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়, পাখি কখন জানি উড়ে যায়।' সুজন মাস্টারকে পথে মেরে ফেলে রাখলেও এগিয়ে যাবার কেউ নেই। পত্রপত্রিকায় সেই রেকর্ডকৃত মুখস্ত কথা ফলাও করে প্রকাশ পাবে, 'পুলিশ লাশ উদ্ধার করিয়াছে, তদন্ত চলিতেছে'। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। কেবল সুজন মাস্টারের সন্তানসন্ততি এতিম হবে।

কাজের মেয়ে হারানোর ঘটনাটা দৈনিক পত্রিকায় এলো, কিন্তু বিকৃতভাবে। আসল ঘটনার বর্ণনা না দিয়ে 'গরিবের মেয়ে, অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে পালিয়ে কোথায় গিয়ে বিক্রি হয়েছে তা কে জানে! অথবা, মাস্টার সাহেব পাচার করে দিয়েছে; মেরে গুম করে ফেলেছে হয়তো; ভাগ্যে কী ঘটেছে তা কে জানে!'– ইত্যাদি হরেক কথাবার্তা।

মাস্টার সাহেবের বক্তব্য পত্রিকায় আসে না, অথচ পন্নীর বাপের বক্তব্য ইনিয়ে-বিনিয়ে আসে। কোনো পত্রিকা বলে না যে, পন্নীর বাপ একটা সোশ্যাল টাউট, মেয়ে হারিয়েছে বটে তবে তার বাপের চোখে পানি নেই, কিংবা মাস্টার সাহেব বিদেশে ছিলেন বলে ফিরে আসতেই অভিনব চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের খপ্পরে পড়েছেন। সবাই লেখে, কাঁদতে কাঁদতে পন্নীর বাপের চোখের পানি শুকিয়ে গেছে; সে শোকে পাথর হয়ে গেছে। রিপোর্টাররা আরও বলে– তারা গরিবের পক্ষে। সুজন মাস্টার ভাবেন– ও, তাহলে তোমরা সত্যের পক্ষ আগেই ছেড়েছো।

পত্রিকার লেখাগুলো সহানুভূতিশীল মানুষের হৃদয় কাড়ে। কোনো কোনো পত্রিকার উঠতি বিপ্লবী-রিপোর্টার ফোনে যোগাযোগ করতে না-পেরে সুজন

মাস্টারের বাসায়, কিংবা অফিসে সময়ে-অসময়ে আসা শুরু করলো। কেউ কেউ পত্রিকায় কী বেরোতে যাচ্ছে তা টাইপ করে মাস্টার সাহেবকে অগ্রিম দেখানো শুরু করলো। ভদ্র ভাষায় ভালোভাবে মাস্টার সাহেবকে বয়ান করে, আর বলে– স্যার, এসব আপনার জন্য অপমানজনক, সমাজে আপনার মান-সম্মানকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। শুনেছি আপনি বিদেশে থাকেন, আল্লাহ দিলে অনেক অর্থ উপায় করেছেন, পয়সা-কড়ি খরচ ছাড়া এসব চাপা দিতে পারবেন না।

আগন্তুকের সংখ্যা বেশুমার। দিনে দিনে সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। অনলাইন পত্রিকাসহ পথে-ঘাটে পত্রিকার অভাব নেই। শুধু অনলাইন পত্রিকার সংখ্যাই ঢাকা শহরে বসবাসরত কাকের সংখ্যার তুলনায় বেশি হবে। অনেক রিপোর্টারকে পত্রিকা অফিস থেকে বেতনও দেয়া লাগে না। শুধু পত্রিকার নামে ভিজিটিং কার্ডটা ছাপাতে দিলেই হয়। বাকি রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা সে স্বউদ্যোগে 'উৎকৃষ্ট বাঙালি হওয়ার যোগ্যতার গুণে' করে নিতে পারে। ধনী হতে বেশি সময় লাগে না। ছত্রছায়ার প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলের শত-সহস্র অঙ্গ-সংগঠনের কোনো না কোনো একটা অঙ্গের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা এবং আত্ম-মধু আহরণ করতে পারলেই উদ্দেশ্য হাসিল; বাকিটা দলের নামে চাহিদা মোতাবেক স্লোগান দেয়ার কাজ। আর চলনে-বলনে ঠাঁটবাটে বড় বড় পরিচয় দিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারা, 'জানেন, আমি কে? আমার ক্ষমতা কত, তা কি আপনি বোঝেন? দারোগার নায়ের মাঝি, তার যে টানে কাছি, তার বাড়ির কাছে আছি।' ভাবখানা এমন দেখায় যে, 'দু কলম ঠুকে যদি পত্রিকায় ছাপিয়ে দিই, তখন শতবার পিছ-পিছ ঘুরলেও আর পার পাবেন না। ইজ্জত দেয়া-নেয়ার মালিক আমি।' কথাটাও নির্ভেজাল বাস্তবতা।

সুজন মাস্টার অবশেষে পুরোনো বন্ধুবান্ধব, যাঁরা বিভিন্ন পত্রিকায় সিনিয়র পদে কাজ করেন তাঁদের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা সবকিছু শুনে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন বটে, তবে বর্তমানে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা যে ভয়াবহ, তা বলতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। বললেন– আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই তো দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে মত্ত; পেশাগত সততা ভুলতে বসেছি।

তাঁরা অসহায়ের মতো বিদ্যমান রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গজানো উঠতি ব্লাকমেইলিং-সাংবাদিতকতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে অনেক খেদোক্তিও করলেন। তাঁরা আজীবন এ পেশায় থেকে আর্থিক উন্নতি করতে পারেননি, অথচ কয়েক বছরের মধ্যে অনেকেই কলমের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে, ভোল বদলে ঢাকা শহরে গাড়ি-বাড়ি ও অঢেল নগদ টাকার মালিক হয়ে গেছে এবং এটা বর্তমানে একটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে– তাও বলতে ছাড়লেন না।

অপরাধবিষয়ক শকুনসদৃশ কিছু রিপোর্টার পারলে সুজন মাস্টারের পরিধেয় বস্ত্রটিও ছিন্ন করে ফেলার উপক্রম করলো। কেউ কেউ এসে সুজন মাস্টার বিদেশে ছিলেন কিনা এবং ব্যাংক ব্যালান্স কেমন আছে, কৌশলে জানতে চায়। কেউবা সুজন মাস্টারের পক্ষে প্রয়োজনে কলমযুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। অবস্থা দেখে মনে হয়, মাস্টার সাহেবের কথার কোনো মূল্য নেই, তিনি যেন কিছুই বোঝেন না; যত বোঝে ঐ-সেই সোশ্যাল টাউট পন্নীর বাপ আর বিভিন্ন পত্রিকার চরিত্রহারা রিপোর্টার। অনেকে তো ফোনে বড় বড় পত্রিকার পরিচয় দিয়ে পন্নীর বাপের পক্ষ নিয়ে প্রথমত বিশ্রী ভাষায় গালাগালি শুরু করে পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো; শেষে তার কথিত অফিসে গিয়ে তার মাধ্যমে একটা আপস রফা করার প্রস্তাব দিয়ে রাগতস্বরে ফোনটা রেখে দিল। ভাবখানা এমন যে, এই অচ্ছুত-চুনোপুঁটি মাস্টারসাহেবের সাথে তার বেশি কথা বলার সময় কোথায়!

এখন যেন বিষয়টা আর পন্নীর বাপের হাতে নেই, গোষ্ঠীপ্রতিম পারিষদবর্গের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন "শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন'। বাবু যত বলে পরিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।" কারণ এখানে পারিষদবর্গের ব্যক্তিস্বার্থ সম্পৃক্ত।

সুজন মাস্টার বড় অসহায়– নিজেকে অবহেলিত একটা অস্পৃশ্য ক্ষুদ্র প্রাণীসদৃশ ভাবতে লাগলেন। মনে হয়, কোনো এক ঘূর্ণিঝড়ের রাতে তিনি জোয়ারে ভেসে এ-দেশে এসেছেন, কোথাও তাঁর কেউ নেই। আঁকড়ে ধরার খড়কুটোটুকুও নেই। শুধু ভাবেন, 'আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে, তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' আর বলতে

ইচ্ছে করে, 'ধরণী দ্বিধা হও, তোমার কোলে মুখ লুকাই।' চলতি পথে সুযোগমতো একটা চামচিকাও কাজের মেয়ে হারানোর গল্প তোলে, বিদেশে ছিল কি-না জিজ্ঞেস করে, আর কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। টাকা, টাকা আর টাকা। সবাই টাকার গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, সুযোগমতো ইশারায় চায়। পন্নীর বাপের এলাকার অসংখ্য উঠতি পাতি-নেতার দল কখনো ফোনে, ফোনে না পেলে কারো-না-কারো মাধ্যমে বিষয়টা মীমাংসা করার আশ্বাস দিয়ে নিজেকে অনেক ক্ষমতাধর, বড় নেতাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে বলে দাবি করে। পরিণামে লাখ লাখ টাকা চায়। সবটাই পন্নীর অসহায় গরিব বাপকে দেবে বলে জানায়। নিজের অংশটার কথা চেপে যায়। নিজেকে এলাকার জনদরদী, স্বার্থত্যাগী নেতা বলে দাবি করে। অরাজকতা কাকে বলে!

সুজন মাস্টার চারদিকের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না। কাজের মেয়েকে খুঁজেও পাচ্ছেন না, অথচ জনে-জনে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করছেন, আজ যদি তিনি লেখাপড়া না-শিখে, 'আন্ডার ম্যাট্রিক' হয়ে (কত ক্লাস আন্ডার তা বিবেচ্য বিষয় নয়) এ-দেশের কোনো এক লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান হতে পারতেন, লুটেরাগোষ্ঠীর সদস্য হতে পারতেন, তাহলে সমাজের সমাসীন ক্ষমতাধর সবাই তাঁকে সম্মান ও সমীহ করে চলতো। এসব বিভিন্ন রং-বেরঙের চাঁদাবাজ তো দূরের কথা, কোনো একটা পাখিও তার ঠ্যাং দেখিয়ে সামনে দিয়ে উড়ে যেত না। বড় বড় নেতারা এসে তাঁর গুণগান গাইতে গাইতে সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতো। সবাই তাকে সত্যের পরাকাষ্ঠা অসীম সাহসী নেতা হিসাবে মানতো, বড় বড় পদ দিত। এ-এক আজব দেশ! আজব তার মানবগোষ্ঠী।

খুব আক্ষেপ সুজন মাস্টারের মনে। জীবন গড়তে বড় ভুল করে ফেলেছেন। কেন যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে যান! এটাও আরেকটা ভুল। কেনই-বা তিনি লেখাপড়া শিখে মাস্টার হয়েছেন! অন্য দাপট-দেখানো পেশাও তো ছিল। এখন 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' গেছে। তিনি হুমকি-আসা বিভিন্ন ফোন নম্বরগুলো ডাইরিতে টুকে রাখতে লাগলেন। তাঁর কাছে চাঁদা-চাওয়া বিভিন্ন লোকের ঠিকানা ফোননম্বরসহ ডাইরিতে লিখতে লাগলেন। এক সময় থানায় গেলেন। সবকিছু খুলে

বললেন। থানার লোকজন তাঁকে সম্মান দেখালেন, লম্ফ-ঝম্ফ করলেন। আশপাশের চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী গ্রুপের কাউকে-কাউকে তিনি থানায় বসে গল্প করতে দেখলেন। থানার একজন কর্তাব্যক্তি তাঁকে খোলাখুলি বললেন– স্যার, আপনি সম্মানীয় লোক, আমার আব্বাও একজন শিক্ষক ছিলেন, থানায় বেশি আসার দরকার নেই। আপনার ছোট ভাই কিংবা নিকটতম কেউ থাকলে তাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে বলবেন। আমাদের কাজেরও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। আপনি শিক্ষক মানুষ, এত কিছু বুঝবেন না।

সুজন মাস্টারের মোবাইলে হঠাৎ একটা ফোন এলো। নিজেকে পন্নীর বাপের এলাকায় বাড়ি, ঢাকাতে ব্যবসা করে বলে জানালো। পন্নীর বাপের চাচাতো ভাই তাদের ইটভাটার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে, সে-সূত্রে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা– তাও জানালো। সুজন মাস্টারের বিষয়টা সে শুনেছে এবং একজন সম্মানীয় লোক সমাজে অসম্মানিত হতে চলেছেন, সে-বিষয়েও সে খুব উদ্বিগ্ন– তা জানাতেও বাকি রাখলো না। সুজন মাস্টারকে বললো– এ বিপদের দিনে আপনার পাশে দাঁড়াতে চাই, সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে চাই, আপনার সাথে দেখা হওয়া দরকার। আপনি যদি আগামীকাল বিকেলে এদিকে আসেন, তো একটা রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলা যাবে।

সুজন মাস্টার তার কথায় আশান্বিত হলেন। পরদিন এক সহকর্মীকে সাথে নিয়ে সেই রেস্টুরেন্টে বসে লোকটার সাথে কথা বললেন। লোকটা প্রথমে যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখালো। তারপর একনাগাড়ে বলে চললো– দেখুন, আমি কিন্তু বিরোধী দলের রাজনীতির সাথে জড়িত, আমাদের দিনকাল বর্তমানে খুব খারাপ যাচ্ছে। কোনোমতে টিকে আছি। নইলে আপনাকে এ বিষয়ে অনেক সহযোগিতা করতে পারতাম। আপনি কি জানেন, আপনার নামে কোর্টে একটা কেস হয়েছে? পন্নীর বাপকে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ ভাবার কোনো কারণ নেই। সে যথেষ্ট চালাক ও বুদ্ধিমান। সে আমার কাছে প্রায়ই আসে, ফোনে যোগাযোগ রাখে। গরিব মানুষ, তাদের দিকে তাকালে না-করতে পারিনে। কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করি। যা-কিছু করে আমাকে সবই জানায়। ওকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। বর্তমানে মিডিয়ার যুগ। কোনোকিছু চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। আমারও

অনেক বন্ধুবান্ধব মিডিয়ার সাথে জড়িত। ধরে নিন মেয়েটা মারা গেছে। মেয়ের মা-বাপকে মেয়ের শোক ভোলাতে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে। আমি নিজে টাকা চাচ্ছিনে। তবে আমাকে পন্নীর বাপ বিশ্বাস করে বিধায় সমাধানটা আমার মাধ্যমে করতে চাচ্ছে। মোটামুটি একটা এস্টিমেট দিতে পারি। আপনি বিদেশে থাকেন এটা আমি শুনেছি। আপনার সম্মান অনেক। সম্মান একবার গেলে শেষ জীবনে আর ফিরে পাবেন না। আপনার পক্ষে কি লাখ পঞ্চাশেক টাকা খরচ করা সম্ভব? আপনি চাইলে আপসরফা করে টাকা কিছু কমিয়ে দেব। আমি টাকা চাচ্ছিনে, আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছে, এটা পন্নীর বাপের দাবি। আগেই বলেছি আমি বর্তমান সরকারি দলের নই, অনেক বিপদের মধ্যে আছি। তারপরও আপনার এ বিপদ আমাকে ব্যথাহত করছে। তাই আপনাকে ফোন করে এখানে আসতে বলেছিলাম। আপনার নামে পন্নীর বাপ শিশু অপহরণ, হত্যা ও লাশ গুমের মামলা দিয়েছে, যা জামিন অযোগ্য। সে বর্তমানে বিভিন্ন পত্রিকার অফিসে যাচ্ছে, টিভি মিডিয়ার কাছে যাচ্ছে, মানবাধিকারভিত্তিক এনজিওর কাছে যাচ্ছে, সেখানে যা করছে আমাকে বলছে। বর্তমান সমাজে মানি লোকের মান-সম্মান রক্ষা করা বড্ড কঠিন। আর অন্যায় করে পার পাওয়া তো আরো কঠিন। মামলার কাগজপত্রগুলো সব আমাকে দেখিয়েছে। প্রয়োজনে কেস তুলে নিতে বলবো। কিন্তু আপনি পরিবারসহ একবার অ্যারেস্ট হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। জামিন অযোগ্য অপরাধ। আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলেও তা করতে কমপক্ষে পাঁচ-সাত বছর লেগে যাবে। ততদিন আপনাকে জেলে পচতে হবে, কিংবা এই শেষ বয়সে জেলেই মরতে হবে। আদালতে ঢোকা অনেক সহজ, কিন্তু বেরোনো অনেক কঠিন। বর্তমান চাকরিটাও হারাবেন, পত্রিকাগুলোতেও ফলাও করে প্রচার পাবে। বিষয়টা খুব ভালো করে দু-একদিনের মধ্যে ভেবে দেখার জন্য বলছি। মানবতাবাদী এনজিওগুলো ও বিভিন্ন পত্রিকা যদি আপনার পিছনে লাগে, তো আপনাকে নিঃশেষ করে ছাড়বে। তখন আমার করার আর কিছুই থাকবে না।

সুজন মাস্টার সবকিছু শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন– আমি শিক্ষক মানুষ, পক্ষ তো শুধু আপনি একা নন; আপনার মতো অসংখ্য পক্ষকে আমার মোকাবিলা

করতে হচ্ছে, এমনই অনেক পক্ষকে আমার পিছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। টাকার জন্য খিজলিয়ে খাচ্ছে। এত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। বিদেশে গিয়েছিলাম, এটাই আমার অপরাধ। দেশটা মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে এ-বোধ আমার ইতোমধ্যেই হয়েছে। এ-দেশে আমার কথার কোনো মূল্য না থাকলেও, বেশি কিছু না-বুঝলেও, ভাত তো আমিও একটু-আধটু খাই। এবার আমি আসি।

সুজন মাস্টার সহকর্মীকে সাথে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। কেস নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। যে কোনো সময় গ্রেফতার হতে পারেন, ভাবলেন। তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না যে, পাশের বাসার পাঁচতলার চলতি-সন্ত্রাসী ঐ দম্পতি, পন্নীর সোশ্যাল-টাউট বাপ এবং পতিত-রাজনীতির ঐ ক্ষুধার্ত পাতিনেতা জোটবদ্ধভাবে একে অন্যের যোগসাজসে চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী নেতাদের 'কোনোরকম নারী ও শিশু নির্যাতন বরদাস্ত করা হবে না' বক্তৃতাকে পুঁজি করে অনুকূল বাতাসে তাঁকে চুষে নিঃস্ব করে দিতে চাচ্ছে। কাজের মেয়ে অপহরণ, হত্যা ও গুম একটা সাজানো নাটক।

দেশে অনেক আইন আছে কিন্তু কোনো প্রয়োগ নেই। পালের গোদারা যখন যেদিকে মুখ ঘোরান, দলবল যত আছে সবাই সবেগে সেদিকে ধাবিত হয়। সুযোগ বুঝে একটা শ্রেণি ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এটাই এ-দেশের রীতি। পলিসি তৈরি হয় ঢাকার কোনো এক অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে বসে রঙিন চশমা চোখে দিয়ে। স্বার্থান্বেষী মহল সেটাতেই হাততালি দিয়ে বাহবা জানায়; ব্যক্তিস্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। বাস্তবে প্রয়োগ হয় সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে, ভিন্ন আঙ্গিকে। কার সাথে কার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব ছিল, অথচ বিয়েটা হয়নি; এখন সুযোগ মতো আলাদা রং মাখিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা। জমিজমা নিয়ে কার সাথে কার বিবাদ আছে, কোনো এক দলে ভিড়ে রাজনীতির ধুয়ো তুলে তাকে নির্বংশ করার অপচেষ্টা। মহল্লায় বা গ্রামে মাতব্বরি নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্বকে কোনো রাষ্ট্রীয় পলিসির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষ নির্মূলের ব্যবস্থা। বিভিন্ন রং ব্যবহার করে স্বার্থ হাতিয়ে নেয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা।

এমনই শত শত ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের নিগড়ে এ-দেশের জাতীয় রাজনীতি ও তার পলিসির আদল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। 'মঘা, এড়াবি কয়-ঘা।' পরিবেশ

পারিপার্শ্বিকতা, আইনহীনতা, নীতিহীনতা রক্ত-মাংসে গড়া সজ্জনকেও সন্ত্রাসী হতে বাধ্য করে। রাষ্ট্রীয় এসব নীতিমালা অথবা চটকদার বক্তৃতার অধিকাংশের বাস্তব প্রয়োগ যে অপপ্রয়োগের নামান্তর, তা আমাদের রাষ্ট্রনায়ক-নায়িকারা বুঝতে অপারগ, কিংবা জেগে ঘুমান। আর একটা পক্ষ এ-দেশের আপামর টাউটগোষ্ঠীকে সাধারণ মানুষের সম্পদ ও সরকারি কোষাগার লুটপাটের জন্য যেন লেলিয়ে দিয়েছে। 'যে যত পারো লুটে-পুটে খাও, শুধু আমার নামে স্লোগানটা দাও।' এ ভূখণ্ডটা টাউটদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। কেউ সোশ্যাল টাউট, কেউ মিডিয়া টাউট, কেউবা লিগ্যাল টাউট, সরকারি টাউট, অগত্যা বেনামি টাউট, বর্ণচোরা টাউট, দেশটাই টাউটে ভরপুর। কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। এমনকি ঘৃণাভরে থুথু ফেলতে গেলেও কোনো না কোনো টাউটের গায়ে পড়ে। মিথ্যার দাপট যেখানে প্রকট, স্পষ্ট সত্যও সেখানে প্রশ্নের সম্মুখীন– নির্নিমেষ চাহনিতে দাঁড়িয়ে থাকা করুণার পাত্র। সব শ্রেণির টাউটগুলোই পলিটিক্যাল টাউটদের হাত ধরে এ-দেশে জন্ম নিয়েছে, কর্মযজ্ঞে নেমেছে এবং পেশায় টিকে আছে। সুজন মাস্টারের ধারণা, রাজনৈতিক টাউটারির অবসান হলেই কেবল সব টাউট থেকে দেশ ও সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে।

সুজন মাস্টার নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেলেন। কিছু শিক্ষক এসে ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার বিভাগের একজন শিক্ষকের এহেন অবস্থার মধ্যে পড়ার কথা বললেন। তিনি উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে সবে জাপান থেকে ফিরেছিলেন। বাড়ির কাজের মেয়েকে একদল প্রতারক ফুসলে নিয়ে গিয়ে, তার মা-বাপকে টাকার লোভ দেখিয়ে, ঐ শিক্ষককে ভয় দেখিয়ে দেড়টা বছর ধরে রক্ত চুষে খেয়ে শেষ করে ছেড়েছে, এখন শুধু খোলসটুকু পড়ে আছে। এটাও একটা সংঘবদ্ধ চক্র।

এ-দেশে চক্র এবং চক্রান্তের অভাব নেই। সহকর্মীরা সুজন মাস্টারকে সাবধান করে দিলেন। অন্য এক সহকর্মী এসে তার বোনের বাড়ির একই রকমের একটা ঘটনা তুলে ধরলেন। সবাই একমত হলেন যে, পেশাগত কারণে বিদেশ যাওয়াটাই তাঁর কাল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, সংঘবদ্ধ চক্রের বাইরেও 'নীতিবান' বাঙালি সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত একটা স্বতন্ত্র টাউট-চক্র সক্রিয়। এরা, যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, নাগালের মধ্যে এলেই কিংবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার নামে, অথবা ভয়

দেখিয়ে, চলতি-উড়ে-বেড়ানো সুযোগ কাজে লাগিয়ে টাকা উপার্জনের পথ ধরে। সুজন মাস্টারের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে।

যখন কোনো জনগোষ্ঠী নীতিবিবর্জিত, পথহারা-জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় তখন সে-সমাজে একশ্রেণির মানুষ এবং ইতরপ্রাণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইতরপ্রাণীর সাথে পেরে ওঠা সহজ কিন্তু ঐ-সব চরিত্রহীন মানুষের সাথে পেরে ওঠা অনেক কঠিন। কারণ, মানুষের জটিল ও কুটিল বুদ্ধি ইতরপ্রাণীকেও হার মানায়। ইতরপ্রাণী কথা বলতে পারে না, কিন্তু মানুষ নামের কলঙ্কিত প্রাণীগুলো কথার মারপ্যাঁচ দেখিয়ে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রভাবিত করতে পারে। মুখে মধুমাখা কথা ও পেটে বিষ ধরে রাখতে পারে। নিজের ক্ষমতাকে জাহির করতে পারে। জটিল-কুটিল বুদ্ধি দিয়ে, জিব ঘুরিয়ে, আইনহীনতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক টাকা ও ক্ষমতার মালিক হতে পারে, তবে পরিবেশটাকে অশান্তিময়, দুর্বিসহ ও বসবাসের অযোগ্য করে তোলে। কোনো পক্ষ উন্নয়নের মুলো নাকের ডগায় নিরন্তর ঝুলালেও পরিণামে জাতির কলঙ্ক বাড়ে, দিনে দিনে পুরো জাতি ধ্বংসের অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হয়।

সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা খুবই দুরূহ হয়ে উঠলো। কিন্তু এর মধ্যেও সমাজসচেতন সুজন মাস্টার এ-দেশের সামাজিক অবক্ষয় ও এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এটা তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তিনি ব্যক্তিপর্যায়ের সমস্যাগুলোকে সার্বিক সমস্যার দৃষ্টিতে দেখেন, জাতীয় সমস্যা হিসাবে ভাবেন, বিশ্লেষণ করেন, বিভিন্ন ফোরামে তা তুলে ধরেন। এ-ছাড়া তাঁর কী-ই-বা করার আছে!

ক বছর আগের একটা ঘটনা তাঁর স্মৃতিতে এলো। তারেক মাসুদ এবং মিশুক মুনির নামের দুজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ঢাকা থেকে দৌলতদিয়া রুটে মাইক্রোবাসযোগে যাবার সময় মানিকগঞ্জের কাছে অকস্মাৎ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। শোকের ছায়া নেমে এলো সবার মনে। প্রত্যেক পত্রিকায়ই এ হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ পেল। একটা পত্রিকায় একটা বিশেষ খবর এ-সময় সুজন মাস্টারের দৃষ্টি কেড়েছিল। তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনিরকে বহনকারী গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ার সাথে সাথে রাস্তার দুধার থেকে আসা লোকজন মুহূর্তের মধ্যে তাদের ক্যামেরা, হাতঘড়ি, মোবাইল ফোনসহ সঙ্গে

থাকা যাবতীয় দ্রব্যাদি লুঠ করে নিয়ে নেয়। সুজন মাস্টারের ভাবনা, বাঙালির এ চরিত্র তো কোনোদিনই ছিল না। বাঙালি আজীবন সহজ-সরল, বিপদের বন্ধু, অকৃত্রিম আন্তরিকতায় ভরপুর। পেটে ভাত না-থাকলেও ত্যাগে অদ্বিতীয়। তাহলে এ চরিত্র কি বাঙালির পরিবর্তনশীল সমাজের সদ্যপ্রাপ্ত অধুনা-নতুন রূপ? সহজ-সরল বাঙালি কি তাহলে অলক্ষ্যে ক্রমশ লুটেরাগোষ্ঠীতে পরিণত হতে চলেছে? নাকি ইতোমধ্যেই এ-কাজে অনেক দূর এগিয়ে গেছে? আমরা কোন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছি? উন্নয়নের কথিত জোয়ারে ভাসতে ভাসতে নরকের কোন বিলীয়মান অন্তঃসলিলে পতিত হচ্ছি? আমাদের জাতীয় নেতারা কি তাহলে পুরো জনগোষ্ঠীকে ক্রমশ চরিত্রহারা জনগোষ্ঠীর দিকে সতত ঠেলে দিচ্ছে? চিন্তাশীল লোকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শুধু বড় বড় ফাঁকা বুলি আউড়ে, বক্তৃতা-বিবৃতি কিংবা বিজ্ঞাপনের সমাহারে জাতি গড়া যায় না– নিজের চরিত্র ঠিক রাখা চাই, আত্মজিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়া চাই। আমরা ক্রমশই আত্মপ্রবঞ্চক হচ্ছি না-তো?

মাত্র বারো-তেরো দিনের ব্যবধান। সুজন মাস্টারের এক ছাত্র মিড-টার্ম পরীক্ষায় অনুপস্থিত। পরীক্ষার বিশ-পঁচিশ দিন পর ছাত্রটি এসে মেক-আপ পরীক্ষা নেয়ার জন্য অনুরোধ করলো। তিনি অভিভাবকসহ আসতে বললেন। অভিভাবক এসে চা খেতে-খেতে তাঁকে যে তথ্য জানালেন, তা শুনে সুজন মাস্টারের চোখ চড়কগাছে উঠে গেল। অভিভাবক ভদ্রলোকটি জানালেন, তিনি সপরিবারে একটা মাইক্রোবাসে সিলেট যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে মাইক্রোবাসটা দুর্ঘটনায় পড়ে। ছেলেটা বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মেয়েটার মরমর অবস্থা, রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটছে। অন্যান্য সবাই বেশ আহত। সাথে সাথে দু পাশের লোকজন ছুটে এলো। সাহায্যের নাম নেই, সবার মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিল। মৃতপ্রায় মেয়েটার শরীর থেকে অভিভাবকের চোখের সামনে গয়নাগাটি যা ছিল একে-একে খোলা শুরু করলো। ব্যাগপত্র গাড়িতে যা ছিল সব লুটে নিল। সে এক অরাজক অবস্থা। দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অভিভাবক ভদ্রলোকের শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো।

সুজন মাস্টারের মনে প্রশ্ন, ঢাকা-দৌলতদিয়া রুটের ঐ লুটেরা লোকগুলো ঢাকা-সিলেট রুটের ঐ দুর্ঘটনা-কবলিত জায়গায় গিয়ে কাকতালীয়ভাবে

একত্র হলো কীভাবে? তারা কীভাবেই-বা জানলো যে, ঢাকা-সিলেট রুটে ঐ জায়গায় এক্ষুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে? তাহলে কি দেশের সমস্ত রুটের সব জায়গায় লুটেরাশ্রেণির পদচারণা? লুটেরাশ্রেণি কি দেশব্যাপী সর্বত্র বিস্তৃত? সুজন মাস্টার দুটো ঘটনা থেকে শুধু দুর্ঘটনার কারণে লুটসংক্রান্ত দৈব নমুনা সংগ্রহ করলেন। নমুনা দুটো এ-দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিতে চান। কিন্তু বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই তো আবার পক্ষপাতদুষ্ট দলবাজিতে দিশেহারা। ফলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, প্রকৃত ফলাফলের চাইতে প্রকাশিত ফলাফলের মানবিচ্যুতি ঠিকঠাকমতো হিসাব করা হবে তো? সেখানেও সন্দেহ রয়ে যায়। যাবেন কোথায়! 'সর্ব গায়ে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা?'

সুজন মাস্টার অফিস থেকে বাসায় ফিরলেন। অকস্মাৎ দুই টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান দলবলসহ বাসায় হাজির। অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললো। কতক্ষণ আর ধৈর্য ধরে ভালো ভালো শালীন ভাষা মুখে বলা যায়! তারা আবার সব মতামত জনসমক্ষে প্রচার করবে না, তাদের সুবিধামতো অংশ নিয়ে, কোথাও বা বাক্যের অর্ধাংশ নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। কাউকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে বক্তব্যকে মনমতো কাটছাঁট করে যেটুকু রাখলে নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়– তা তারা প্রচার করবে। স্বাধীন দেশের কর্ম-স্বাধীনতা। এসব রকমফেরের আড়ালে অভিনব ব্যবসা, ব্যক্তিভিত্তিক ব্যবসা। কারো উপর ক্ষিপ্ত হলে প্রয়োজনে দিগম্বর করে ফেলতেও পারে। কেউ তাদের কিছুই করতে পারবে না। ব্যক্তি হয়ে পাহাড়ের সাথে কি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? জনসমক্ষে দিগম্বর হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সামনে দুটো পথ খোলা আছে। এক. রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট দেখানোর সামর্থ্য থাকতে হবে, অথবা দুই. জমি কিংবা ভিটে বাড়ি বেচে হলেও পকেটকে উজাড় করে দিতে হবে। এমনই গণ্ডা-দুয়েক টিভি চ্যানেলের অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী অনুষ্ঠানের প্রতিবেদক ক্যামেরাসহ সুজন মাস্টারের পিছ-পিছ ধাওয়া শুরু করলো। মাস্টারি জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুললো। বাস্তবে দেখা গেল, দরদাম ও তথ্যের মারপ্যাঁচের খেলা, রুজি-রোজগারের খেলা। সুজন মাস্টার সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে উপহাসের পাত্রে পরিণত হলেন। অপরাধী বটে! তাঁর মনে এ-বিশ্বাস জন্মালো যে, এ-দেশের টিভি চ্যানেলগুলোর সামনে বসে সাধারণ দর্শক যে ছবি দেখে,

ভিতরের ছবি হয়তো-বা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্য এবং স্বার্থ নিহিত আছে 'হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে'।

সপ্তাহ না যেতেই পন্নীর বাপ 'মানবাধিকার' গোষ্ঠীর এক তুখোড় সদস্যসহ বেশ কিছু লোকজন নিয়ে বাসায় হাজির। তুখোড় সদস্য নিজেকে খুব ক্ষমতাবান এবং প্রতিষ্ঠানটার 'এক্সিকিউটিভ জেনারেল সেক্রেটারি' বলে গর্বের সাথে পরিচয় দিল। তাদের প্রতিষ্ঠানই এ-দেশের মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যতম ওয়াচ-ডগ বলে দাবি করলো। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বর্তমান ক্ষমতাধর সকল ব্যক্তির সাথে তার অত্যন্ত দহরম-মহরম আছে এমন ভাবখানা প্রকাশ করলো। কথাগুলো বলার মধ্যেও অসংখ্যবার তার ফোনে খুব দামি দামি লোক ফোন করতে থাকলো। সে চিৎকার করে খুব কৃতিত্বের সাথে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দিতে থাকলো। ভাবখানা এরকম যে, সে হুকুম দিলে এ-দেশের এখনই কেয়ামত হয়ে যাবে। তবে সে-হুকুম সে দেবে না– তারও তো একটা দায়িত্ববোধ আছে! চেয়ারে বসার সাথে সাথেই একটা নাম্বারে ফোন করে উপস্থিত সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে, সে পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তাকে ফোনে জানালো– সে বাসাটিতে সুন্দরভাবে পৌঁছে গেছে।

সুজন মাস্টার তার এ হাবভাব দেখে মনে মনে প্রথমেই তাকে 'মানবিক টাউট' নামে অভিহিত করলেন। পন্নীর বাপের আজ ভারতীয় উঠতি নায়কের আধুনিক দাড়ি-ছাঁটার আদলে থাক-কাটা থাক-কাটা দাড়ির সদ্য ছাঁট সুজন মাস্টারের দৃষ্টি এড়ালো না। তাঁর ভাবতে অবাক লাগে, যার মেয়ে হারিয়ে গেছে, সে আবার আধুনিক ফ্যাশনদুরস্ত স্টাইলে দাড়ি ছাঁটার সময় পায় কখন? যে তামান্নার মা পন্নীকে সুজন মাস্টারের বাসায় দিয়েছিল, তার সাথে দুদিন আগেও যোগাযোগ করে জানা গেছে, পন্নীর বাপ গ্রামে হা-ডু-ডু খেলে বেড়াচ্ছে। মেয়ে হারানোর শোক ভোলার আজব পন্থা বটে। ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা-বিবৃতি, তর্ক-বিতর্কের পর 'সম্মানীত' 'মানবিক টাউট' অখ্যাত মাস্টার সাহেবকে কয়েক মাসের জন্য জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন মন্তব্য করে এবং তার প্রতিষ্ঠানে নামকরা পঁচিশ-ত্রিশ জন প্যানেল আইনজীবী আছে, এসব কথা প্রকাশ করে দলবলসহ বিদায় নিল। যাবার সময় একটা ভিজিটিং কার্ড সুজন মাস্টারের হাতে যোগাযোগের জন্য ধরিয়ে দিল।

সুজন মাস্টার ইশারায় বুঝলেন, কার্ডের শানে-নুজুল। রাতে তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কার্ডের উল্লিখিত নামের ওয়েবপেজে ঢুকলেন। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে ওয়েবপেজটা তৈরি করা হয়েছে। সবই ঠিকঠাক কিন্তু ভিতরে টাউটারি। টাকা ধরার অভিনব বেসাতি।

পন্নীর বাপ সেই পতিত পাতি-রাজনীতিবিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিভিন্ন নাম-সর্বস্ব 'মানবাধিকার' নামাঙ্কিত কথিত প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য পদাধিকারী-ব্যক্তিবর্গের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াচ্ছে। হাতে দুটো ডকুমেন্ট, একটা পন্নীর অস্পষ্ট মুখচ্ছবি, আরেকটা অস্পষ্ট ছোট্ট ভিডিওর সিডি। আট মাস আগে ছাদে যে সুজন মাস্টারের স্ত্রী মেয়েটাকে অনেকের সামনে মেরেছিল, তার ক্যামেরাবন্দি ছবি। ইচ্ছে করেই মুখচ্ছবি ও ভিডিওকে টেকনিশিয়ান দিয়ে অস্পষ্ট ও বিকৃত করা হয়েছে, যাতে সুবিধামতো ব্যাখ্যা দেয়া যায়। পাশের বাসার পাঁচতলায় বসবাসরত মহিলা ও তার স্বামী পন্নীর বাপকে সম্প্রতি তা সরবরাহ করেছে। আট মাস আগেই কেন এ-ছবি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি বা পুলিশকে কেন দেওয়া হয়নি, কেন সুজন মাস্টার দেশে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো, মুখচ্ছবিই-বা বিকৃত হলো কী করে– জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। ছাদের চারপাশে তো আরো অনেক মহিলা ছিলেন, তারাও তো দেখেছিলেন। এত মাস ধরে পন্নী বিভিন্ন ফ্লাটে যাচ্ছে, টিভি দেখছে, বাচ্চাদের সাথে ছাদে খেলছে, কারো চোখে ক্ষত ধরা পড়লো না– শুধু ঐ চাঁদাবাজ মহিলার ক্যামেরায় ক্ষত চলে এলো কীভাবে? এসব প্রশ্ন কে কাকে করবে? যৌক্তিক প্রশ্ন করাতে গেলেও এ-দেশে নগদ নজর-সেলামি দিতে হয়, এটাই অলিখিত পাকাপোক্ত, স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ। ছবির ও ভিডিওর কপি প্রত্যেকটা সুবিধাভোগেচ্ছু এজেন্টের হাতে হাতে।

সুজন মাস্টারের কাছে এমনই গণ্ডায়-গণ্ডায় 'মানবাধিকার' নিয়ে কাজ-করা কৃরিতকর্মা ব্যক্তিত্ব আসতে লাগলো। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের নাম 'মানবাধিকার' শব্দটাকে বজায় রেখে আগে-পিছে চটকদার শব্দ জোড়া দিয়ে তৈরি। কতই-না বাহারি নামের ভুঁইফোড় সংস্থা! সবাই মানবাধিকারকে উদ্ধার করে ছাড়ছে। প্রত্যেকেই একটা করে ওয়েবপেজ খুলে বড় বড় কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে কোনো প্রয়াত কিংবা জীবিত খ্যাতিমান ব্যক্তির ছবি সংস্থার প্রধান বলে চালিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন দাতা ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে ফান্ড আসছে। আড়ালে-আবডালে

কিংবা প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেয়ার 'মহতী উদ্যোগ' ত্বরান্বিত হচ্ছে।

উড়ে-বেড়ানো টাকা হাতে আসাতে দেশ দরিদ্র থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সুজন মাস্টার গংয়ের মানবাধিকার দেখার কেউ নেই– সেটা উপেক্ষিত ও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আর প্রকৃতপক্ষেই যাঁরা মানবাধিকারের মহতী উদ্যোগ নিয়ে কাজে লেগেছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। জীবন পথের প্রতিটা বাঁকে বাঁকে এমনই অসংখ্য প্রতারণার ফাঁদ পাতা, পদে-পদে বিপদ। সাধারণ মানুষ হিসাবে টিকে থাকাটাও কঠিন, জীবন বাঁচানো আরো কঠিন। অসৎ সঙ্গ প্রতিনিয়ত হাতের ইশারায় ডাকছে, 'এসো এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে।' 'এসো, দলে ভেড়ো– সব বিপদ, বালা-মুসিবত আসান হবে। রুজি-রোজগার বাড়বে, সামাজিক পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।' সুজন মাস্টার, পোড়-খাওয়া এ বাস্তব অভিজ্ঞতায়, এ-দেশের আজব উন্নয়নমুখী কর্মচাঞ্চল্য-কর্মধারা দেখে তাজ্জব বনে যান। দেখার কেউ নেই, নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই, খেলা চলছে অবিরাম। নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা নিয়োজিত তারাও খেলোয়াড়দের প্রত্যক্ষ সহযোগী।

মোটামুটি আরও গণ্ডা-তিনেক গোষ্ঠী এলো, কোনোটার নাম 'গরিব সহায়তা কেন্দ্র', কোনোটা-বা 'মিসকীন সহায়তা সমিতি'– এমনই বিচিত্রভাবে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ। এখানেও 'সহায়তা' শব্দটা ব্যবহার করে তার আগে-পরে 'নিঃস্ব' কিংবা 'গরিব', কোথাও-বা 'আইন' শব্দটাকে ব্যবহার করে নামগুলো সাজানো। এক বা একাধিক পদাধিকার ব্যক্তি। কথার মধ্যে টাউটারির ছাপ। প্রত্যেককেই 'এনজিও' শব্দটাকে ঘন-ঘন ব্যবহার করতে সুজন মাস্টার দেখলেন। আসল এনজিওর ভাঁজে-ভাঁজে এহেন অসংখ্য ভেজাল এনজিওর সমারোহ। গরিব-সহায়তা নামে ভিজিটিং কার্ডসর্বস্ব ব্যবসা। কোথাও না-কোথাও থেকে 'ফান্ডের' সংস্থান হয়। এছাড়া 'শিকার' অনুসন্ধান চলে। কোনো অজুহাতে 'শিকার' একটা ধরতে পারলেই তাকে শুষে যতটা পারা যায় পেটভর্তি করে ফেলাটাই প্রধান উদ্দেশ্য।

এ ধরনের কল্যাণকামী(?) প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য সুজন মাস্টারের নজরে এলো। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেরই পনেরো-বিশজন করে 'সুদক্ষ কৌশলী' প্যানেল-আইনজীবী আছে। বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে

গরিবের অনুকূলে মামলা একটা ঠুকে দেয়াতে পারলেই উদ্দেশ্য হাসিল। গরিবের পক্ষ নিয়ে অনন্তকাল আইনি লড়াই চালিয়ে যাবার মতো হিম্মত ও দৃঢ় প্রত্যয়ে তারা বলীয়ান ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মামলাতে জেতা-হারা বড় কথা না, সেদিকে খেয়ালও নেই। খেয়াল হলো, মামলাটা যতদিন বা যত বছর পারা যায় দীর্ঘায়িত করতে পারলেই প্রতিষ্ঠানে আগত নিয়মিত ফান্ড থেকে 'আইনজীবীর ফি'-এর নাম করে এবং যাতায়াত খরচ দেখিয়ে উদ্দিষ্ট অর্থ উঠিয়ে পকেটস্থ করার এক অবিরাম প্রক্রিয়া অব্যহত রাখা। তাছাড়া ফাঁদে-পড়া শিকারের কাছ থেকে দরদাম করে, কোর্ট ও জেলের ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে যা আদায় করা যায়, সেটাও তো নেহায়েত কম নয়। দরদামে 'হাজার' শব্দটা তিন অক্ষরের হওয়ায় মুখে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে একটু বড় শব্দ। সেক্ষেত্রে 'লাখ' শব্দটা দুই অক্ষরের বিধায় অনেক আয়েশে উচ্চারণ সম্ভব। চাওয়ার সময় একটু বেশি অংক চেয়ে ফেলতে বাধা কোথায়? চামড়ার জিব, কয়েক দিনের প্রাকটিসে ক্রমশই জিহ্বার আড়ষ্টতা কমে আসে– আজব সিস্টেমে আজব ব্যবসা অবিরাম চলছে। প্রত্যেকটা এরকম ভুঁইফোড় এনজিও-নামধারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরই চলমান পত্রপত্রিকার একটা ব্যাক-আপ সাপোর্ট আছে। আজব সহাবস্থান।

নৈতিক চরিত্র পরিশুদ্ধ না হলে কলম যেদিকে খুশি ঘোরানো যায়, যা খুশি বলা যায়। স্বাধীন দেশের স্বাধীনতার আস্বাদন। সুজন মাস্টারের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। 'পড়বি পড় মালির ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই।' সুজন মাস্টার তো এতদিন ছাত্র পড়িয়ে খেয়েছেন, 'কত ধানে কত চাল' দেখেননি। এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। 'চোক্ষের নজর এমনি কইরা একদিন ক্ষইয়া যাবে-এ-এ, পোড়া চোক্ষে যা দেখিলাম তাই রইয়া যাবে, হো-ও-ও, তাই রইয়া যাবে।' এতদিন 'ঘুঘু দেখেছে, ঘুঘুর ফাঁদ দেখেনি।' এবার ঐতিহ্যবাহী বাঙালির নব-নব আবিষ্কৃত কুটিল ঘুঘুর উন্নয়নের ফাঁদে পড়েছেন। এখন 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'। কেঁদেও এর শেষ নেই। সর্বস্ব বিক্রি করে টাকা খসাতে হবে, ঢালতে হবে– নইলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। সুজন মাস্টার একটা ফুটবলে পরিণত হয়েছেন। এখানে একই গোষ্ঠীর কিংবা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অসংখ্য খেলোয়াড়। একজন খেলে খেলে কসরত দেখিয়ে বল অন্য পায়ে ঠেলে দিচ্ছে, অন্য পা থেকে আরেক পা, আবার পা বদল, শোষণের খেলা অবিরাম চলছে।

সুজন মাস্টার এক নিকটাত্মীয়কে বাসায় ডাকলেন। খুন ও গুম কেসের আসামি হওয়ার কথা বললেন। ব্যাংকের চেক বের করে ব্যাংকে-থাকা টাকার পরিমাণটা বলে একাধিক চেকে সই করে তাকে দিলেন। বেশি টাকার দরকার হলে কিছু বন্ধুবান্ধবের ঠিকানা দিলেন, তাদেরকে জানালে ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে জানালেন। জমি বিক্রির দরকার হলে কোন জমিটা কীভাবে বিক্রি করতে হবে, সবই তাকে খুলে বললেন। জেলে যাবার সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেন। ভাবলেন, ওয়ারেন্ট ইস্যু হবার কথা শুনলেই তিনি নিজেই কোর্টে গিয়ে হাজির হবেন। অফিসের সহকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অবহিত করলেন। বুকের অসুখে আক্রান্ত সুজন মাস্টার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মতো হয়ে গেলেন। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। কেউ কিছু দিলে খান, না-দিলে উপোস। আত্মভোলা, নির্জীবপ্রায় হয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। 'শিকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা ভাঙিতে না পারে, পাখি ছটফটাইয়া মরে, পাখি ধড়ফড়াইয়া মরে। মনরা পাখি আমার, মনরা পাখি ...।'

এ-দেশের শাসকগোষ্ঠী সমাজ ও জীবনপথের মোড়ে মোড়ে 'মানবসম্পদ উন্নয়নের (নাকি ধ্বংসের?)' যে অজস্র ট্রেনিং সেন্টার খুলে রেখে দিয়েছে, তাদেরকে মুখে খেঁউড়-খিস্তি কেটে গালাগালি করতেই শুধু সুজন মাস্টারের ভালো লাগে। আর ঐ টাউটের বাচ্চা পন্নীকে কেন যে এত বলার পরও তাঁর স্ত্রী বিদায় দিতে এত দেরী করলো, সেটা ভেবে অনুশোচনায় ভোগেন। পরিশেষে, ছোটবেলায় বক্কা বয়াতির মুখে শোনা ধুয়োজারি গান জন-মানবহীন মাঠের দূরপ্রান্তে বসে গলা-ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে–

'আগে জানতাম যদি এমন পচা
তবে দিতাম না আর তলায় খোঁচা,
এখন যায় না মোছা কোচার কাপড়েতে,
মোল্লার সাথে মোল্লার সাথে
মুরগি দাঁড়ায় ফ্যাকামেতে
মোল্লার সাথে মোল্লার সাথে।'

সুজন মাস্টারের অনেক সহকর্মী দিনে দিনে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁকেও বার বার যেতে বলেছেন। সুজন মাস্টার কি কখনো ভাবতে পেরেছেন যে, এ-

দেশটা নানা কিসিমের টাউটে ভরে যাবে? বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যাবে? দেশটা অরাজক রাজ্যে পরিণত হবে? তাঁর তথাকথিত আদর্শের এ-দেশে কোনো মূল্যই থাকবে না? এ-দেশটা টাউটদের স্বর্গরাজ্য হয়ে যাবে? তাই তাঁর এত আক্ষেপ। যতবারই তিনি বিদেশে যান, সাময়িক সময়ের জন্য যান। থাকতে পারেন না– ফিরে চলে আসেন। একটা জীবনছোঁয়া গানই তাঁর অন্তরকে আজীবন নাড়া দেয়, তাঁকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে আসে, "যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা, যার নদীজল ফুলে-ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা, যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা ...।" এখন জেলে যাওয়া এবং সম্মান হারানো ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর কি?

নির্ঘুম রাত কাটিয়ে পরের দিন সুজন মাস্টার নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেলেন। ক্লাস নিচ্ছেন। একটা ফোন নাম্বার থেকে বার বার ফোন আসছে। সুজন মাস্টার ফোন ধরলেন, ক্লাসে আছেন জানিয়ে আরো এক ঘণ্টা পর ফোন করতে বললেন। এক ঘণ্টা পর আবার ফোন এলো। কোনো এক বিশেষ বিভাগের সদস্য পরিচয় দিয়ে কথা বলা শুরু করলো। ক্রমশই খারাপ শব্দ ব্যবহার করা শুরু করলো। সুজন মাস্টারকে অবিরাম চাপ দিতে থাকলো। তাদের অফিসে তাঁকে এক ঘণ্টার মধ্যে হাজির হবার জন্য জোর করতে লাগলো। তার বক্তব্য মোটামুটি একই, 'আমরা মেয়ের বাপকে চিনি, সে গরিব মানুষ। তার সাথে আমাদের মাধ্যমে একটা আপসরফা করে ফেলুন। ধরে নিন মেয়েটা মারা গেছে, নইলে এতদিন আপনি খুঁজে দিতে পারতেন। তাকে আর পাওয়া যাবে না। আপনি বিদেশে থাকেন তা আমরা জানি। একটা জীবনের মূল্য কত তা আপনার জানা উচিত। যদি ভালো চান তো লাখ পঁচিশেক টাকা নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করুন। অথবা আপনি যেখানে আসতে বলেন আমরা সেখানে আসবো। আমরা বিষয়টা মিটিয়ে দিচ্ছি। নইলে তো আপনি জানেন, আমরা যে কোনো সময় আপনাকে উঠিয়ে আনতে পারি। আর একবার উঠিয়ে নিয়ে এলে ক্রসফায়ারে পড়াটা কঠিন কিছু নয়। আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনি একজন অপরাধী।'

এর এক সপ্তাহ আগে আরেক ব্যক্তি একই বিভাগের পরিচয় দিয়ে ফোনে অনেক কথা সুজন মাস্টারের সাথে বলেছিল। মনে হলো, দু জনের মধ্যে একটা

যোগাযোগ আছে। সে-ও সুজন মাস্টারকে একজনের সাথে দেখা করতে বলেছিল। টাকা খরচ করে তার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার কথা বলেছিল। তার ব্যবহারটা মোটামুটি শালীন। এবারের মতো এত অভদ্র ও ধমকের ভাষা সেবার তাঁকে শুনতে হয়নি। সুজন মাস্টার একই বিভাগ থেকে করা ফোন নম্বর দুটো নামসহ ডাইরিতে টুকে রাখলেন। আবার ভাবলেন– হয়তো কোনো ভুয়া পরিচয়ে টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে।

কিন্তু ভয় সুজন মাস্টারের পিছু ছাড়লো না। অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরুদুরু করতে লাগলো। কখন কে বা কারা না-জানি উঠিয়ে নিয়ে যায়! এমন ঘটনা তো প্রতিনিয়ত কতই ঘটছে! তাদের ধমক, অত্যাচার ও দাবির কাছে সুজন মাস্টার নিজের অস্তিত্বকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে ভাসমান খড়কুটোর সমান বলে মনে করতে লাগলেন। জীবনপ্রদীপ নিভু নিভু প্রায়। তাঁর প্রশ্ন– এখন কার কাছে যাব? রক্ষক এখানে ভক্ষক।

তাঁর মনে হচ্ছে, আত্মহত্যা করতে পারলে সকল যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তিনি বুঝলেন, এমন অবস্থার মধ্যে পড়লেই মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে তাদের কী হবে? তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

কিছু সহকর্মীর সাথে কথা বলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঐ বিভাগে কর্মরত একজন পুরোনো ছাত্রের খোঁজ মিললো। সুজন মাস্টার ফোন করে এবং তার অফিসে গিয়ে দেখা করলেন, ঘটনাটা পূর্বাপর খুলে বললেন। ঐ দু জনের ফোন নম্বরসহ নাম দিলেন। সে সুজন মাস্টারকে আশ্বস্ত করলো এই বলে যে, 'স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওরা আর কখনো আপনাকে বিরক্ত করবে না।' সুজন মাস্টার দম ছেড়ে বাঁচলেন এবং ছাত্রের দেয়া চা-র কাপে চুমুক দিলেন। ছাত্রটা তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বললো যে, চেষ্টা করুন ওরা যেন কেসে চলে যায়।

সুজন মাস্টার বললেন– ওরা সম্প্রতি কেস করেছে শুনেছি, কিন্তু ওরা তো বিচারের জন্য কেস করছে না, আমাকে চাপে রাখার জন্য করছে। চাপে রেখে টাকা আদায় করতে চায়; জেলে ঢোকাতে চায়। আমাকে জামিন অযোগ্য মামলায় জেলে ঢোকাতে পারলেই আমার সহায়-সম্পদ সবকিছু লুটে নিতে

আর কোনো বাধা থাকে না। ওরা তো আমার শত্রু না, আমার সম্পদটুকু ওদের হাতে চলে গেলেই আমার সাথে ওদের আর কোনো বিবাদ থাকবে না। আমাকে 'নীতিবান মাস্টার', 'বড় ভালোলোক' বলে ওরাই একদিন দাবি করবে, আমার পক্ষে স্লোগানে যোগ দেবে।

পুরোনো ছাত্রকে একাকী পেয়ে সুজন মাস্টার অনেক কথাই বললেন। আরও বললেন– অসংখ্য পক্ষ পন্নীর বাপের পক্ষ নিয়ে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করছে, জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে, হেন ভাষা নেই যা বলতে দ্বিধাবোধ করছে। যে কোনো অপমানজনক ভাষায় পত্রিকায় লেখালেখি করছে, মানবতাবাদী সংগঠনের নামে গরিবদরদী সেজে শোষণ করছে, আমার নামে শিশু অপহরণ, খুন ও গুমের মিথ্যা কেস দিচ্ছে। আট মাস আগে কোনো কারণবশত যদি আমার স্ত্রী তাকে মারধর করেই থাকে, তো তার নামে শিশু নির্যাতনের কেস তখন দিতে পারতো। বিকৃত করা অস্পষ্ট ছবির ভিত্তিতে যদি বিচারে তার সাজাও হতো, সেটাতেও আমার আপত্তি ছিল না। আমি তো তখন দেশেই ছিলাম না। তাছাড়া পন্নী যেদিন বাসা থেকে বেরিয়ে যায়, তা ঐ বিল্ডিংয়ের অনেকেই দেখেছে, আমি ও আমার স্ত্রী বাসায়ও ছিলাম না, এটাও সবাই জানে। সেক্ষেত্রে আমি অপরাধী হই কী করে? এই বুঝটা ওরা বুঝতে চাচ্ছে না কেন? তাহলে এত আয়োজন, দুর্ব্যবহার, অসম্মান, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো, সব কিছুরই লক্ষ্য আমার সম্পদ-শোষণ নয় কি? যারা আমাকে অপমানিত করছে, তাদের কাউকেই তো আমি কোনোদিন দেখিনি, কোনোভাবেই চিনিনে, তাহলে শত্রুতা হবে কী করে? আসলে দেশটা লুটেরার দলে ভরে গেছে। 'যে যেভাবে পারো হাতিয়ে নাও'– এটাই পরম নীতি। আইনের পক্ষপাতদুষ্ট প্রয়োগ হচ্ছে। ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষ প্রতিটা পদে পদে নিগৃহীত এবং শোষিত হচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে লুটেরার দলকে পৃষ্ঠপোষকতা করছি, জেগে ঘুমাচ্ছি। আমরা জাতি হিসাবে কোন অন্তহীন নৈরাজ্যে চলেছি, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

নিজের ক্ষোভের কথা ছাত্রটাকে বলতে পেরে সুজন মাস্টার নিজেকে একটু হালকা বোধ করতে লাগলেন। ঐ দিনের মতো চলে এলেন।

সুজন মাস্টার অফিসে গেলে এক সহকর্মী তাঁদের এক ছাত্রকে নিয়ে সুজন মাস্টারের রুমে এলেন। এবার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে

জানালেন। এ-দেশে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, সে দলের ক্ষমতাধর নেতা ছাড়া সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ আইন ব্যক্তিভিত্তিক চলে। এতদিনে সমাধানের একটা পথ বেরিয়ে এসেছে। ছাত্রটাও সুজন স্যারের বিষয়টা নিয়ে খুব আশাবাদী। স্যারের মতো লোকের এভাবে হয়রানি কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। আর মামা যেহেতু বড়-মাপের নেতা, মামাকে গিয়ে সব চক্রান্তের কথা বুঝিয়ে বলবে। ক্ষমতাধর মামা ভাগ্নের কথায় সব সমাধান করে দেবেন ইনশাল্লাহ।

ঐদিন ছাত্রটা বুকভরা আশা নিয়ে পরের দিন আবার আসবে বলে বিদায় নিল। সহকর্মীটা সুজন মাস্টারকে বললেন– এবার একটা ভালো পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। আজকাল গ্রামে-গঞ্জে গরু হারালেও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সাহায্যের জন্য ধন্না দিতে হয়, নইলে গরু ফিরে আসে না। ঘরে ঘরে রাজনীতি, দাম্পত্যজীবনেও রাজনীতি। রাজনীতি এখন সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী এবং সর্বনাশা। সব সমস্যার সমাধানের জন্যই নেতা দরকার, নেতারাই জাতির ভবিষ্যৎ, অষ্টধাতুর মাদুলি, সর্বরোগের মহৌষধ।

সুজন মাস্টার তেমন কিছুই বললেন না। শুধু বললেন– চেষ্টা করে দেখুন। দেখা যাক ছাত্রটা আগামীকাল কী খবর নিয়ে আসে।

পরদিন বিকেলে সহকর্মীটা মনমরা অবস্থায় সুজন মাস্টারের কাছে হাজির। ছাত্রটা তাঁর কাছে এসেছিল। খবর খুবই ভালো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তার মামার দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক। সব জায়গার রাজনৈতিক গুণ্ডাবাহিনী তার ইশারায় চলে। শুধু চোখের ইশারায় সব চুপ। কিন্তু মামা তাদের অফিস খরচ বাবদ লাখ দশেক টাকা স্যারকে দিতে বলেছে। মামা নিজে একটা টাকাও স্যারের কাছ থেকে নেবেন না, সবই অফিস খরচ।

সহকর্মীটা সুজন মাস্টারকে বললেন– আমি কিন্তু এত টাকা খরচ করে এসবের মধ্যে যেতে নারাজ। অন্য পথ দেখা যাক।

সুজন মাস্টারও তাঁকে বললেন, ঐ ছাত্রকে একটা বুঝ দিয়ে বিদায় করে দিতে।

ছাত্রের শিক্ষকের প্রতি মমত্ববোধ থাকতে পারে, কিন্তু ছাত্রের মামারও যে মমত্ববোধ থাকতে হবে, এমন কোনো কথা তো যুব-রাজনীতিতে লেখা নেই।

আর বিনা লাভেই যদি কাজ করবে, তবে দানছত্র খুলে বসে দাতা হাতেমতাইয়ের খাতায় নাম লেখালেই তো চলে। রাজনৈতিক ব্যবসায় নামার দরকার কি? এক্ষেত্রে বিনা খরচে সমাধান চাওয়াটা ক্ষুদ্র-মনের সুজন মাস্টারের আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্য এক সহকর্মীকে নিয়ে সুজন মাস্টার আইনজীবী হাতড়াতে লাগলেন। মামলা যেহেতু হয়েছে, আইনজীবী তো একজন দরকার। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, এ আরেক আজব রাজ্য, আইনের রাজ্য। 'বাঙালির হাইকোর্ট' দেখানোর রাজ্য। এখানে সরকারি কোনো বেতন নেই। যে যার মক্কেলের কাছ থেকে বিভিন্ন কথা বলে, আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে, মক্কেলকে সুযুক্তি দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, কখনও-বা ফাঁদে ফেলে, যতদিন পারা যায় কেসটাকে ঝুলিয়ে রেখে আয়-রোজগার করার একটা কসাইখানা। পূর্ববঙ্গীয় সমাজে দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে একজন আরেকজনকে এই বলে অভিশাপ দেয় যে, 'তোর ঘরে যেন মামলা ঢোকে।' এ আজব রাজ্যে 'যে যত পারো আদায় করো জিব ঘুরিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে, মামলা পেঁচিয়ে।' আত্মজিজ্ঞাসার কোনো বালাই নেই। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে কোর্ট-বিল্ডিংয়ের ইটও নাকি টাকা চায়। বাদি-বিবাদি কেউ-না-কেউ তো নিশ্চয়ই নির্দোষ। অথচ এখানে সত্যের কোনো বিবেচনা নেই, আছে আইনের নানামুখী ব্যাখ্যা, কথার মারপ্যাঁচ, আর কাগজপত্র। সত্য-মিথ্যা, ডাহামিথ্যা লিখেও কাগজ তৈরি করতে পারলেই কেস শুরু হয়ে গেল, হার-জিত পরিণামে বুঝা যাবে, ততদিনে জীবন শেষ।

মামলার ফাইল জমতে জমতে পাহাড়সমান হয়েছে, এটা কালক্রমে আকাশ ছুঁয়ে যাবে। কোনো একজন আইনজীবী বিবাদির মুখের দিকে না তাকিয়েই যে কোনো ডাহামিথ্যে লিখে দেবে কিংবা বলে ফেলবে। আগেকার সময়ের সেই নীতিবান আইনজীবী ও আইনের ব্যবসা এখন আর নেই। দিন বদলেছে। অনেকেই গত হয়েছেন কিংবা যাঁরা টিকে আছেন, মৃতপ্রায় হয়েই টিকে আছেন। হাতে গোনা অল্প কিছু আইনজীবী আছেন যাঁরা পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া নৈতিকতা নিয়ে পেশাতে টিকে থাকতে চান, কিন্তু বিধি বাম। তাদের দিনকাল খুব মন্দা। যাদের দাপট বিদ্যমান তারা লিগ্যাল-টাউট, সে-সাথে চলমান

পলিটিক্যাল টাউটারির ধন্বন্তরি প্রশিক্ষণ যোগ হয়েছে। রাজনীতির বিষবাষ্প এ পেশাকেও স্পর্শ করেছে। এখানেও রাজনীতির জটিল খেলা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়ে তাদের আওতা বৃহৎ হয়েছে, রাজনীতি দেখিয়ে পরিণামে পদে বসার সমূহ আশা জেগেছে। এটাও এক অরাজক জায়গা। সুজন মাস্টার পত্রপত্রিকায় আগেই পড়েছেন যে, ওখানে মনমতো সাক্ষী কিনতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও ভুয়া সিলমারা অবস্থায় যখন যেমন দরকার কিনতে পাওয়া যায়। টাকা উড়ে বেড়ায়। যে মন্ত্রের সাধন করতে পেরেছে, সে উড়ে-বেড়ানো টাকা অনায়াসে ধরে এর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে।

সুজন মাস্টার তাঁর সহকর্মীকে নিয়ে কোর্ট-পাড়ায় গেলেন। আইনজীবী আগেই কেসের কপি উঠিয়ে রেখেছেন। সুজন মাস্টার আট পৃষ্ঠার কেসের কপিতে একবার চোখ বুলালেন। তিনি প্রতিটা পৃষ্ঠাতেই চোখে সরষের ফুল দেখছেন। একজন মানুষের বিরুদ্ধে আরেকজন মানুষ এমন বানোয়াট-মিথ্যা কথা লিখতে পারে তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ঘটনার যা বর্ণনা, তার আশি-ভাগই মিথ্যাতে ভরা এবং খুব অশালীন ভাষায় লেখা। হেন মিথ্যা নেই যা লেখা হয়নি। সুজন মাস্টার নিজেকে খুব অপমানিত এবং অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আট পৃষ্ঠাব্যাপী ভাষার নমুনাস্বরূপ দু-একটা বাক্য এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক: "... আসামীগণ উচ্চ-শিক্ষিত, সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টকারী, কাজের মেয়েকে গুমকারী, সন্ত্রাসী, হারমাঈদ প্রকৃতির এবং আইনের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ এবং নিরীহ মানুষের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করাই আসামীগণের একমাত্র পেশা ও নেশা হয় বটে। ... আসামীগণ আরও বলে যে, এই ব্যাপার নিয়ে যদি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিস, তাহলে তোকেসহ তোর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে জীবনে শেষ করিয়া ফেলিব।"

আইন ব্যবসা যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার বেসাতি, তা সুজন মাস্টার কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। কোনো পক্ষ সত্য, আবার কোনো পক্ষ মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে– এটা তো সত্য। এতে আইনজীবী বাদিকে পক্ষে নিয়ে যা-খুশি তাই বিবাদির বিরুদ্ধে লিখতে পারে, তাও তাঁর জানা ছিল না। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর লেখাপড়ার মানও যে ভালো না, এটাও সুজন মাস্টার বুঝলেন। পুরো আট পৃষ্ঠা

লেখাতেই অসংখ্য সাধু ও চলিতের মিশ্রণে ভরা, অসংখ্য বানানে ভুল। 'হারমাঈদ' শব্দটা মুখস্ত করে গৎবাঁধা হুবহু বসিয়ে দিয়েছে। 'হারমাঈদ' শব্দটা যে আসলে 'হারমাদ' তাও হয়তো সে জানে না। 'হারমাদ' যে পর্তুগিজ একজন কুখ্যাত জলদস্যুর নাম তাও ঐ আইনজীবীর নিশ্চতভাবেই অজানা। ঐ লিগ্যাল টাউটের বিরুদ্ধে সুজন মাস্টারের আবার কিছু করারও নেই। এ-দেশের আইন তাকে আইন দিয়ে সুরক্ষিত করেছে। অথচ সে নিম্নমানের কিছু লেখা ও কিছু পড়া শিখে ন্যূনতম নৈতিকতা ও মানবতা নিয়েও আদালতের পবিত্র প্রাঙ্গণে আসেনি। সুজন মাস্টার ভাবলেন, এক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবৃতিতে স্বাক্ষরের কারণে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিধান থাকলে, আদালত প্রাঙ্গণে এ ধরনের টাউট আইনজীবীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেত।

কেসের নকল উঠিয়ে জানা গেল, বাদিপক্ষ বিবাদিকে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারির জন্য আবেদন করলেও আদালত সি.আর. মামলা হিসাবে থানায় বিষয়টা তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং একটা নির্দিষ্ট দিনে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছে।

আইনজীবীর চেম্বার থেকে আদালত প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে প্রধান রাস্তায় ওঠার আগেই পথে একজন পুরোনো ছাত্রের সাথে সুজন মাস্টারের দেখা। ছাত্রটা তাঁর সাথে সালাম বিনিময়ের পর ওখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সুজন মাস্টার সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি পুরোনো ঐ ছাত্রটা কী করে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলেন যে, ছাত্রটা এখন আর তাঁর সেই ছোট ছাত্র নয়, এখানে সম্মানিত পদে বড় সরকারি চাকরি করেন। সুজন মাস্টারের স্মৃতির পাতা খুলে গেল। অতীতকে ভাবতে গিয়ে এবং সামনে ছাত্রটাকে দেখে এ ক দিনের সীমাহীন কষ্টের কথা, দুর্ভোগের কথা, মিথ্যা-বানোয়াট অভিযোগের কথার ঢেউ যেন একসাথে মনের মাঝে আলোড়িত হতে লাগলো। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। ভাবানন্দে চোখে পানি চলে আসার উপক্রম হলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। মনে পড়ে গেল, এ ছাত্রটা ক্লাসের বাইরেও সুজন মাস্টারের সাথে নিয়মিত দেখা করতো। তার কথা ও কাজে আদর্শ ও নৈতিকতা ফুটে উঠতো। আজ সে অনেক বড় হয়েছে, বড় পদে গেছে। এটাই সুজন মাস্টারের আনন্দ। ছাত্রটা হয়তো এখনও সেই নৈতিকতা ও আদর্শের ধ্বজা ধরে টিকে আছে। কথা প্রসঙ্গে সুজন মাস্টার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– আচ্ছা, তোমরা

তো সমাজের কুখ্যাত পেশাদার ও অপেশাদার টাউট, চোর-ডাকাত, প্রতারক পরিবেষ্টিত হয়ে মিথ্যা-লেখায় ভরা লক্ষ-লক্ষ ফাইলের মধ্যে বসে হাতে গোনা কিছু সত্যাশ্রয়ী আইনজীবী, অগণিত পথভ্রষ্ট আইন-ব্যবসায়ী এবং প্রতারণার ফাঁদে-পড়া ভুক্তভোগীকে নিয়ে অফিসে কাজ কর, এর মধ্যে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করো কী করে? এই জঘন্য পরিবেশের মধ্যে বসে তোমরা কীভাবে কাজ করো– আমি বুঝতে পারছিনে। তোমাদের নাক এই দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে থাকতে থাকতে হয়তো দুর্গন্ধ-প্রুফ হয়ে গেছে; যেমনি অনেক বছর বাস করতে করতে এ-দেশের সুচিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনও অরাজকতা-প্রুফ হয়ে গেছে। প্রথম দিন এসে, চারদিকে তাকিয়ে আমার সবকিছুই যেন অবাক লাগছে।

ছাত্রটা মৃদু হাসলেন, বললেন– সব সময়ই যে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারি তা নয়, অনেক সময় অনেক কিছু বুঝলেও আমার করার কিছুই থাকে না; নথি ও পারিপার্শ্বিকতার বাইরে আমরা যেতে পারিনে, এটা আমাদের অপারগতা। ছাত্রটা আরও বললেন– স্যার, চলুন আমার অফিসে যাই, বসে চা খাই। অত দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি তো আপনাকে ভালোভাবে চিনি ও জানি, আশা করি এ বিপদ থেকে আপনি মুক্তি পাবেন।

সুজন মাস্টার আর কথা না বাড়িয়ে ছাত্রটাকে 'আজ আর না, পরে আসা যাবে' বলে বিদায় দিলেন। কিন্তু মনে মনে একটা ভয় ও ঘৃণা কাজ করতে লাগলো, তিনি যে-প্যাঁচে পড়েছেন, যে আপামর শোষকগোষ্ঠী তার পিছু লেগেছে, এই আদালত প্রাঙ্গণের এই জঘন্য পরিবেশে সময়ে-অসময়ে আসবেন কী করে? তার মন-মানসিকতা তো এটা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

থানা থেকে তদন্তে এলো। বিল্ডিংয়ের সবার, প্রতিবেশীদের ও স্থানীয় সমিতির অনেকের বক্তব্য শুনলো। পন্নী কীভাবে বেরিয়ে গেছে, কে কে দেখেছে, কোথা থেকে গেটের চাবি নিয়েছে, কার সাথে সব সময় ছাদে উঠে কথা বলতো, ছাদের পাশে বসবাসরত ঐ মহিলার আচার-আচরণ কেমন, অতীতে কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল, বর্তমান অবস্থা– সব কিছু জানলো, কাগজে লিখে নিল। অনেকের বিবৃতি রেকর্ড করে নিল। পুলিশ অফিসার অনেকের সামনে সুজন মাস্টারকে আশ্বাস দিলেন যে, এ তদন্তে সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা রিপোর্ট দেয়া হবে না। ছাদের পার্শ্ববর্তী পাঁচতলার ঐ মহিলা যে তড়িঘড়ি করে ইতোমধ্যেই বাসা ছেড়ে

চলে যাবার নোটিশ বাসার মালিককে দিয়েছে তাও পুলিশকে জানানো হলো। তার চলাফেরা যে সন্দেহজনক সেটাও বিভিন্নজন জানালেন। পন্নীর মুখে মলমের প্রলেপ দিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে ঐ মহিলা যে অনেক মাস আগে ছবি তুলেছিল, তাও বাসার পার্শ্ববর্তী মহিলাঙ্গন থেকে বেরিয়ে এলো। এ বিল্ডিংসহ চারপাশের আরো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা পরিবারের মধ্যে একমাত্র ঐ মহিলার চোখেই যে শিশু নির্যাতন ধরা পড়ে– তা বলতেও কেউ কেউ ছাড়লেন না।

মামলার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো। সুজন মাস্টারের অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। এর মধ্যেও চারপাশ থেকে ঘিরে-ধরা নব্য শকুনের বিভিন্ন গোষ্ঠী সুজন মাস্টারকে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া অব্যাহত রেখেছে। কোনো কোনো পত্রিকা জাবরকাটা পুরোনো খাবারকে নতুনে পরিণত করে বিচার প্রভাবিত করায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সুজন মাস্টারের শরীরে মাংস যেহেতু প্রায় শেষ, মাংসের শেষাংশ কিংবা হাড় চেটে কিছুটা তৃপ্তি লুটে নেয়ার চেষ্টা করছে। অনেক শুভার্থী বন্ধুবান্ধব সুজন মাস্টারকে মোবাইল ফোন ধরতে নিষেধ করলেও তিনি প্রতিটা কলই ধরেন এবং বিদ্যমান সমাজকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করেন। তিনি এই চৌত্রিশ বছর শিক্ষকতার পর কেন জানি খিটখিটে মেজাজের অসহিষ্ণু ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন।

অবশেষে, মামলার ধার্যকৃত দিন এলো। পুলিশ রিপোর্ট যথাসময়ে পাঠিয়েছে। রিপোর্টের কপি আইনজীবীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে সুজন মাস্টার সংগ্রহ করলেন। রিপোর্টে সুজন মাস্টারের অনেক গুণগান গাওয়া হয়েছে। পন্নী কাউকে না-বলে স্বেচ্ছায় বাসা থেকে চলে গেছে, তা কে কে দেখেছে সেটাও সাক্ষীসহ উল্লেখ আছে। বিল্ডিংয়ের অন্য সদস্যরা এবং বাড়ির আশপাশ বসবাসরত কেউই পন্নীর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন কখনো দেখেননি তাও উল্লেখ আছে। কিন্তু পাশের বাসার পাঁচতলায় বসবাসরত ঐ মহিলার কর্মকাণ্ড, সন্ত্রাসী বাহিনী এনে ভয়-ভীতি দেখানো, অবিরাম হুমকি, পন্নী বেরিয়ে যাবার আগে ছাদে উঠে ঐ মহিলার সাথে গোপন আলাপ, এ বিষয়ে মহিলার অসংলগ্ন কথাবার্তা– এসব সম্বন্ধে রিপোর্টে কোথাও কিছু নেই। পুলিশ সত্য রিপোর্ট দেবে বলে কথা দিয়েছিল, সে কথা তারা রেখেছে কিন্তু আরো অনেক সত্যকে গোপন করেছে।

পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক কথাবার্তা সুজন মাস্টার আগে থেকেই শুনে আসছেন এবং পত্রপত্রিকায় দেখছেন। এ ঘটনায় পুলিশের সান্নিধ্যে এসে এবং রিপোর্ট দেখে এ বিভাগের অনেক সদস্য সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা তাঁর মনে সৃষ্টি হলো। আর এ বিশ্বাস জন্মালো যে, দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির চর্চা ও নির্মল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটলে এই পুলিশ বাহিনীকেই ভালোভাবে পরিচালিত করা সম্ভব। বাস্তবে পুলিশ বিভাগের তুলনায় অন্যান্য অনেক বিভাগ ও সংগঠনকেই বরং অধিক অব্যবস্থিত, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বিকারগ্রস্ত বলে সুজন মাস্টারের কাছে প্রতীয়মান হলো।

পুলিশের রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট, সুজন মাস্টার পুলিশকে সুবিধা দিয়ে এটা করিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি আসলেই খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছেন ইত্যাদি বিবৃতি দিয়ে বাদিপক্ষের আইনজীবী আদালতে পুনঃতদন্তের প্রার্থনা করলো। ব্যস, এত তদন্ত, দৌড়াদৌড়ি সব শেষ।

সুজন মাস্টার এতদিনে বুঝে ফেললেন, কেন ডাইরি করার সময় কয়েকজন তাঁকে উল্লেখ করতে বলেছিল যে, কাজের মেয়ে কিছু স্বর্ণালংকার ও টাকা নিয়ে পালিয়েছে। মিথ্যা কেসের বিরুদ্ধে পাল্টা মিথ্যা কেস। বছরের পর বছর চলতো। মিথ্যায় মিথ্যায় ঠোকাঠুকি হতো। শত মিথ্যার দাপটে সত্যকে খুঁজে বের করা কঠিন হতো। এটাই এ-দেশের চলতি বাস্তবতা। এক্ষেত্রে সুজন মাস্টারের নীতিকথা, সত্যকথন নিতান্তই অচল। জগৎটা মিথ্যার দখলে। মিথ্যার জয়-জয়কার।

সুজন মাস্টার তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার খোঁজ পেলেন। তাঁর সাথে দেখা করলেন। ভদ্রলোককে দেখে ও কথা বলে তাঁর ভালোই লাগলো। ভদ্রলোক পোড়-খাওয়া ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। তাঁকে সুজন মাস্টার ঘটনাটা খুলে বললেন। রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক প্রত্যেকটা পর্যায় থেকে তাঁকে ব্ল্যাকমেইলিং করে, হুমকি দিয়ে যে যেভাবে পারে শোষণ করতে চাচ্ছে– তাও সবিস্তারে বললেন।

ভদ্রলোক সব কথা শুনে তাঁর মতামত দেয়া শুরু করলেন। তাঁর কথা হলো– কোনো দেশের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের চরিত্র নষ্ট হতে বাধ্য, তখন আর কোনো বাছ-বিচার থাকে না। তিনি বললেন– পুলিশ বাহিনী বিরোধীদল ও জঙ্গি সমীকরণ মেলাতে ব্যস্ত। আপনার মতো পিঁপড়ে-সদৃশ

মাস্টারসাহেবের কাজের মেয়ে কোথায় গেল না-গেল; তা-নিয়ে আপনি নিগৃহীত হচ্ছেন, নাকি জেলে যাচ্ছেন; বিভিন্নপক্ষ আপনাকে শোষণ করছে, নাকি মেরে ফেলছে– এসব দেখার সময় তাদের কোথায়? বরং জেলে গেলেই তো বিভিন্ন পক্ষের রুজি-রোজগার বাড়ে, ফলাও করে রসিয়ে রসিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখতে পারলে পত্রিকার কাটতি বাড়ে। এসব বিবেচনায় না-আনাই ভালো।

ভদ্রলোক ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটা কিছু করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলতে চান– মেয়েটাকে যেহেতু তারা লুকিয়ে রেখেছে, তাকে উদ্ধার করা ছাড়া আপনার কোনো পরিত্রাণ নেই এবং তা অন্য কারো হাতে ছেড়ে না-দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। এ-দেশে কোথাও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই। সর্বত্র অপপ্রয়োগ ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য চলছে। কাউকে বলেও কোনো লাভ নেই। বরং নিজেই একটা কৌশল অবলম্বন করুন। এক্ষেত্রে অবৈধ শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিছু টাকা খরচ করলে তা সম্ভব। যে মহিলা ও তার স্বামী ঐ মেয়েটাকে ফুসলে নিয়ে গেছে তাদেরকে, অথবা মেয়ের বাপকে মস্তান বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে, প্রয়োজনে খুন বা গুম করে মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে তার স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে হবে। শক্তিপ্রয়োগে তারা বাধ্য হবে সবকিছু বলতে। এটাই বর্তমান সমাজে চলছে। মানুষ শক্তি ও অরাজকতার মোকাবিলা পাল্টা শক্তি দিয়েই করছে। এতে পরিবেশ-পরিস্থিতি জঘন্য থেকে জঘন্যতর হচ্ছে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। ব্যক্তি, দলীয় ও রাজনৈতিক অনাচার প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সন্ত্রাস জন্ম দিচ্ছে।

কথাগুলো বলে তিনি কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর আবার বললেন– কিন্তু সমস্যা হলো আপনি একজন শিক্ষক, এসব আপনি পারবেন না। এ-পথে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হবে, আবার নৈতিকতা ও বিবেকবোধকেও বিসর্জন দিতে হবে। তার চেয়ে আমার কাছে আরেকটা বিকল্প প্রস্তাব আছে। আমি তাতে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবো। অবশ্য এতেও আপনার বেশ কিছু টাকা খরচ হবে। এ খরচটা আপনাকে করতেই হবে। ইতোমধ্যে তো অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন। তবে এ পথের সফলতা অনিশ্চিত। প্রয়োজনে গ্রামে কিছু জমি বিক্রি করে ফেলুন, টাকা লাগবে।

সুজন মাস্টার তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোক বেশ ভালোই বলেছেন, এটাই এ-দেশের বাস্তবতা। অস্বীকার করা যাবে না।

ভদ্রলোক আবার বললেন– আমি আমার পরিচিতজন থেকে চার-পাঁচ জন অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ লোক আপনাকে দেব। তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বেতন দিয়ে রাখতে হবে। আপনি পাঁচতলার ঐ মহিলার বর্তমান ঠিকানা, তার আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা, মেয়ের বাপ ও তার আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা, তাছাড়া মেয়েকে কোথায় কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে, তার সম্ভাব্য স্থানগুলোর ঠিকানা ঐ লোকগুলোকে সরবরাহ করবেন। ওদেরকে পরিচালনা আমি করবো, বাকি পরিস্থিতি অবস্থা বুঝে মোকাবিলা করা যাবে।

সুজন মাস্টার বাসায় ফিরে এলেন। ঠিকানাগুলো যথাসম্ভব সংগ্রহ করলেন। ঐ ভদ্রলোকের পাঠানো লোকদের সাথে শলা-পরামর্শ করলেন। তিনজনকে ঢাকায় রেখে বাকি দু জনকে পন্নীর বাপের এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। পাঁচতলার ঐ দম্পতির মা-বাপ, বোন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির ঠিকানায় প্রথমত অনুসন্ধান শুরু হলো। ক দিনের মধ্যেই নিশ্চিত হওয়া গেল যে, এ ব্যবস্থা কাজে লাগবে। পাঁচতলার ঐ মহিলার মা-বাপের ঠিকানায় গিয়ে কয়েক দিন ঘোরাফেরা করে ঐ বিল্ডিংয়ের দারোয়ানকে বেশ কিছু টাকা দেওয়াতেই সে স্বীকার করে ফেললো যে, হ্যাঁ, ছবিতে দেখানো মেয়ের মতো একটা মেয়ে এ বাসায় এসে বেশ কিছুদিন থেকে গেছে। ঐ বাসার আশপাশে খোঁজখবর নেয়াতে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছে।

এমনই বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগত গোয়েন্দা কার্যক্রম চলতে থাকলো। পন্নীর বাপ যে এলাকায় চতুর্থ স্ত্রীকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করেছে আর এলাকার মহান রাজনীতিবিদদের পিছ-পিছ ঘুরছে, সেখানে গিয়েও একটু ভিন্ন রকমের ফাঁদ পাতা হলো। পন্নীর বাপকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার কাছের লোকদের একজন বললেন যে, খুলনাতে তার এক স্যার থাকেন, তাঁর বাসার জন্য একটা কাজের মেয়ে দরকার। বেশ ভালো বেতন দেবে। খাওয়া-পরার কোনো কমতি নেই। প্রয়োজনে স্যারকে বলে মেয়ের পরিবারকেও সাহায্য-সহযোগিতা অনেক করানো যাবে, স্যার খুব ভালো মানুষ, টাকা খরচ করতে তার কোনো জুড়ি নেই। ঢাকার তথ্যে জানা গেল যে, পন্নীর বাপের পক্ষ নিয়ে সুজন মাস্টারের সাথে পঞ্চাশ লাখের দরদাম-করা পতিত রাজনীতিবিদের বাসাতেও মেয়েটা বেশ

কদিন ছিল। পরে বাইরের লোকের আনাগোনায় ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পন্নীর বাপ গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাজারে দাঁড়িয়ে এক ফোনালাপে বলেছে– মেয়েটাকে যে কোথায় রাখি বুঝতে পারছিনে, খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। যেখানেই রাখছি সেখানেই অসুবিধা হচ্ছে, খোঁজখবর চলছে বলে মনে হচ্ছে।

ফোনালাপের খবর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের মাধ্যমে পাওয়া গেল। টাকায় কী-না হয়!

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন বেশ রাতে ফোনের মাধ্যমে জানা গেল, পন্নী তার বাপের হাত ধরে রাতের আঁধারে তার মায়ের বাড়িতে পৌঁছেছে। ভদ্রলোককে জানানো হলো। তিনি বললেন– থানায় পুলিশকে জানিয়ে উদ্ধারের প্রস্তুতি নিতে হবে। আরো বললেন– থানা উদ্ধার করবে না, থানাকে দিয়ে উদ্ধার করাতে হবে।

থানার মাধ্যমে পন্নীকে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করানো হলো। সংশ্লিষ্ট কোর্টে হাজির করানো হলো। পন্নী তার বাপ, পাঁচতলার ঐ মহিলা ও প্রতারকচক্রের সবার কথাই স্বীকার করলো।

পরিচিত অনেকেই বলছেন– স্যার, ওরা আপনাকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল, ঐ চক্রের বিরুদ্ধে মানহানি ও প্রতারণার মামলা করে দিন। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। থানাও বলছে– মামলা ছাড়া তো ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনে।

হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলছেন– আপনার ছেলে-মেয়ে দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজে যেতে পারেনি, আপনি নিজেও চাঁদা ও মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, মান-সম্মান হারিয়েছেন, স্ত্রী শয্যাগত হয়েছে। কোনো আইন আপনাকে আশ্রয় দেয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে যদি আবার মামলাতে যান, আপনার আবার অনেক টাকা ব্যয় হবে, আরো জমি বিক্রি করতে হবে। ঐ সন্ত্রাসী বাহিনী দিনে-দুপুরে আপনাকে ও আপনার বংশধরকে মেরে পথে ফেলে রাখবে। সংবাদপত্রগুলো আবার আপনাকে নিয়ে দলীয় খেলায় মাতবে। কোনোটা কাটতি বাড়ানোর জন্য এই সুযোগে আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অলীক কাহিনী ফাঁদবে। হুজুগে বাঙালি সবকিছুতেই 'ও-মা! তাই নাকি, তাই নাকি– আগে তো জানতাম না!' ইত্যাদি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করবে। মর্গের ইটগুলোও

আপনার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাবে, তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে, নইলে লাশ ওখানেই পড়ে থাকবে, দাফন হবে না। আপনার শোক তারা বুঝবে না। এটাই এ-দেশের রূঢ় বাস্তবতা। আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, দেশীয় বাস্তবতা বুঝতে শিখেছেন। উন্নয়নের জোয়ারে এবং বক্তৃতার তোড়ে সত্য অনেক আগেই এ-দেশ থেকে ভেসে মিথ্যা ও কূটকৌশলের অথৈ সাগরে বিলীন হয়েছে। কোনো সুবিচার কোথাও পাবেন না। টাকা ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে এ-দেশে রাতকে দিন বানানো যায়, কিংবা দিনকে রাত। মগের মুল্লুকে নিত্য বসবাস। শেষ বয়সে এসে আর সুবিচার পাবার আশা করবেন না। এ-দেশে প্রজাতন্ত্রের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন সরকারি দলের কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে গেছে। কেউ হতে বাধ্য হয়েছে, কেউবা সুবিধা ভোগের জন্য শরীরে কাঁচা রঙ মেখে নাচুনে-দলে শামিল হয়েছে। আবার কারো-বা নাভিশ্বাস বইছে। এই তো অবস্থা। তাছাড়া পাল্টা কেস করে আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আপনার জন্য কোনোভাবেই শোভনীয় নয়। কোনোমতে জীবনটা পার করে দিন। মরে বাঁচুন। ছেলে-মেয়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। নিজেও বাঁচুন, অন্যকেও বাঁচতে সহযোগিতা করুন।

সুজন মাস্টারের কাছে অনেক অজানা নম্বর থেকে ফোন আসতে থাকলো– কোনোটা-বা হুমকির সুরে, কোনোটা উপহাসের সুরে, কোনোটা আবার বিশ্রী ভাষায় গালি দিয়ে। তিনি নম্বরগুলো আর ডাইরিতে টুকে রাখলেন না, কিংবা কোথাও গিয়ে অভিযোগও করলেন না। তিনি সব ঘটনার আনুপূর্বিক ভাবতে লাগলেন। এ ভাবনা, বেলাশেষের ভাবনা।

টাকা ও সম্মান যা গেছে তা গেছেই, ও আর ফিরে আসবে না। ছেলেমেয়েদের আবার স্কুল-কলেজে পাঠাতে হবে, স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে হবে। এই শেষ বয়সে এসে আর যাবেন কোথায়! জীবনকে নিয়ে আবার আশায় বুক বাঁধতে হবে। গানপ্রিয় সুজন মাস্টারের লালনের সেই গানটাই বার বার মনে পড়তে লাগলো, 'আশা সিন্ধু তীরে বসে আছি সদাই, আশা সিন্ধু তীরে ...।' এ আশা বাঁচার আশা, নতুন দিনের আশা।

আগস্ট ২০১৬

ক্রোড়পত্রের পাদটীকা

এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে প্রকৃতি যাদের সর্বস্ব গ্রাস করতে চায় নিত্যনতুন ছলে, প্রতিটি দিনের প্রস্থান যাদেরকে শঙ্কিত করে তোলে পরের দিনের আহার সংস্থানের, ভাগ্য নিয়ন্তার উপর জীবনকে সঁপে দেয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর কী! কলকাকলি-ভরা আলোর পৃথিবীতে কে-না নিতান্ত খড়-কুটোকেও সম্বল করে আশার আলো দেখে! কিন্তু সেই সম্বলটুকুও যখন মুষ্টিছিন্ন হয়ে বেলা-শেষের সূর্যের মতো দ্রুত দূরে সরে পালায়, তখন সেদিকে আপ্রাণ ছুটতে গিয়ে, ব্যর্থ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, নিষ্পলক চোখে বিদায়দৃশ্য দেখা ছাড়া আর উপায় থাকে না। দীর্ঘদিনের লালিত আশাগুলো শীতশেষের অতিথি-পাখির মতো আকাশের অজানায় ডানা মেলে দেয়– শেষে অনন্তে মিশে যায়। নিয়তি-বিমুখতার আধুনিক তত্ত্ব তখন লেজ গুটিয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকোয় জবাবদিহিতার ভয়ে, আর অনিশ্চয়তা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় ভাগ-বিমুখ জীবনের নিয়তিকে। শেষে ভগ্ন মনে নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঘরে ফিরে সময়াতিক্রমণে আত্মপ্রবোধ দিয়ে জীবন রক্ষার তাগিদে আবার নিরন্তর জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। চিনিরদ্দীর জীবনটা এমনই গতানুগতিক ঘটনার ফ্রেমে-বাঁধা গতের পুনরাবৃত্তি।

চিনিরদ্দী রাখাল হয়ে দীর্ঘদিন পরের বাড়িতে শ্রম দিয়েছে পেট-ভাতায়। চৈতী ফসল তোলার পর পুব-মাঠের বিস্তীর্ণ জলাভূমির ধার ঘেঁষে সাথী-সমবয়সীদের নিয়ে গরু চরিয়েছে, আর বিলের মরা শামুক কুড়িয়ে তা দিয়ে হারজিত খেলেছে ভর-দিন। কোনোদিন হেরেছে, কোনদিন জিতেছে। জীবনের হারজিত সে কোনোদিন খতিয়ে দেখেনি। জলাভূমির শীতল হাওয়ায় মনে প্রশান্তি বয়ে যেত। ঝুঁকে-পড়া চালের আড়ালে বসে মাথায় হাত দিয়ে সেই কথাগুলোই কেন যেন আজ খুব মনে পড়ছে চিনিরদ্দীর।

চিনিরদ্দীর বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও সংসারে চার-চারটা নতুন মুখ। সংসার বলতে তিন-চারটা মাটির শানকি, একটা কলসী, সিলভারের হাঁড়ি গোটা দুই, হাতলভাঙা কালো কুটকুটে একটা কড়াই, তরকারি কাটা একটা বটি, একটা কাস্তে। বাটনা-বাটা পাটাটা গত আষাঢ়ে বেচে খেয়েছে পেটের দায়ে। খাল-ধারের ভাঙা ব্রিজ থেকে একটা একটা করে এনে খান-পনেরো ইট অতি যত্নে জড়ো করেছে ঘরের কোণে। পরের জমিতে বসত করে এই গোটাকতক ইট তার রংচটা মন কীভাবে যে দিনমজুর-প্রাসাদ সমীকরণ মিলিয়েছে, তা হয়তো সে নিজেও জানে না– বিশ্বকর্মা হয়তো বলতে পারবেন। একজন হিসাববিজ্ঞানীর পক্ষে এ জীবন-ব্যালান্সশিট মেলানো নিতান্তই দুরূহ।

দোচালা ঘরের সামনে হাত-দশেক জায়গা নিয়ে উঠোন। উঠোনের দক্ষিণ কোণে খোলা আকাশের নীচে চুলো। বাড়ির পাশ ঘেঁষে সরু একপেয়ে রাস্তা, চলে গেছে পশ্চিম মাঠে। সেদিকে একটা ফালিকরা বাঁশ বেঁধে তার উপর শুকনো কিছু কলাপাতা আড়াআড়ি ভাঁজ করে কঞ্চি দিয়ে বাঁধা। এতে রাস্তার এবং বাড়ির মানুষের দৃষ্টি বিনিময়ের কিছুটা অন্তরায় হয়েছে। একপাশে কিঞ্চিৎ হেলে-পড়া ঘরটা আখের শুকনো পাতা দিয়ে ছাওয়া। ঘরের ভাঙা বেড়ার উপরে রাখা আছে শতচ্ছিন্ন একটা ধোকড়া কাঁথা, যা রাস্তার প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। এভাবে দিন এনে দিন খেয়ে দিন চলে যাচ্ছে, সংসারের নৌকা একটা মানুষ কাঁধে ভর করে অনবরত গুণ টেনে চালাচ্ছে।

আজ সকালে রাস্তার চৌমাথায় কাঁচি-মাথাল নিয়ে পাকা তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে এসেছে চিনিরদ্দী, কাজের ডাক পড়েনি। গতকালও এমন করেই ফিরে এসেছিল সে। গতরাতে হাড়ি শিঁকে থেকে নামেনি। চৌমাথা থেকে ফিরে এসে তাই আজ মাথায় হাত দিয়ে পিঁড়ের এক কোণে বসে আছে চিনিরদ্দী। ছটা রাক্ষুসী মুখ। যা পায় তাই যেন নিমিষে গ্রাস করে ফেলে। কচুঘোটা, শাক-সিদ্ধ, আস্ত খেসারীর খিঁচুড়ি কিছুই পরোয়া করে না এ-জ্বালাময় পেট। সবকিছু যেন অতলে নিঃশেষ হয়ে যায়। সে-সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাড়ে যেন ঐশ্বরিক আত্মা ভর করেছে। ওদের দাম শুধু উপরে উঠতেই জানে, নামার তোয়াক্কা নেই। চিনিরদ্দী ওদের নাগাল পেতে হাঁপিয়ে উঠেছে।

গত একমাস থেকে ছোট ছেলেটার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে। আর হবেই তো। কোনোদিনই আধপেট ছাড়া ওদেরকে ভরপেট খাওয়াতে পারেনি

চিনিরদ্দী। গত তিনদিন ধরে ছেলেটা জ্বরে ভুগছে, আজ রাত থেকে শরীরটায় যেন আগুন বয়ে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির গনুদের সাথে খেলে বেড়ায় ছেলেটা। একটু দৌড়াদৌড়ি করলে হাঁপায়। অবলা-বোধহীন বলে হয়তো দৌড়ায়, নাচে– শরীরের ভালো-মন্দ বোঝে না, শেষে হাঁপায়। বড়রা হলে বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকতো। অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতায় শ্যামলা শরীর হাঁসা-পানসে। সাদা চোখ দুটো নিয়ে ছেলেটা তবুও হাসে। চিনিরদ্দী ছেলেকে কোলে তুলে সোহাগ করে। ছেলের রুগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়েও ভবিষ্যতের আশার সিঁড়ি খুঁজে ফেরে। হৃষ্টপুষ্ট শরীরের ছবি আঁকে ঝাপসা হয়ে আসা ভবিষ্যতের ক্যানভাসে।

সকালে উঠেই একবার বউ বলেছিল আয়ুব ডাক্তারের কাছে যেতে, আমল দেয়নি চিনিরদ্দী। চৌমাথা থেকে ফেরার পরও দু বার বললো। চিনিরদ্দী বসে আছে তো আছেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেলে ঠেকেছে। এখন বউয়ের কথার গুঁতো সহ্য করতে না পেরে অগত্যা নেমে উঠোনে দাঁড়ালো চিনিরদ্দী। মাথা চুলকাতে চুলকাতে কী যেন ভাবলো– তারপর রাস্তা ধরলো। মাথাটা ওর ঝিম ঝিম করছে, পা দুটো ভেঙে পড়তে চাচ্ছে। গত রাত থেকে অনাহার; শরীরেই-বা আর কত কুলোবে ওর! যাচ্ছে বটে, তবে পা আর ও-বাড়ির দিকে উঠছে না। গতবারের টাকা আজও দেয়া হয়নি ওর। ডাক্তার চেয়ে চেয়ে ইদানীং চাওয়া বাদ দিয়েছে। আবার কোন মুখ নিয়ে ডাক্তারকে বাড়ির উপর আসতে বলবে চিনিরদ্দী– তাই ভাবছে, আর হাঁটছে।

ছেলের অসুখের কথা শুনতেই ডাক্তার অনেক কথা শুনিয়ে দিল ওকে। অগত্যা চিনিরদ্দী ডাক্তারের হাতখানা খপ করে চেপে ধরে কেঁদে ফেললো। কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে সব কথাই খুলে বললো। সন্ধ্যা নাগাদ আরো দুটো রোগী দেখে ফেরার পথে ওর বাড়ি হয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিল ডাক্তার। এবার চিনিরদ্দী বাড়ির পথ ধরলো। বাড়ি এসে দেখলো, বউ পিঁড়ের ধারে ছেলের মাথায় পানি ঢালছে, আর বার বার নিজের চোখ মুছছে। সকাল থেকে যেখানে বসে ছিল, সেখানে গিয়ে চিনিরদ্দী আবার বসলো। ছোট মেয়েটা দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে ক্ষুধার্ত পেটে ঘরের ছায়ায় উঠোনের এক কোণে ধুলোমাখা অবস্থায় কাত হয়ে চতুষ্পদের মতো ধুঁকছে।

সূর্য ক্রমশ পশ্চিমের টানে নিজের উপস্থিতিকে বিদায় জানাচ্ছে। চিনিরদ্দী মুখ থেকে হাতটা নামিয়ে মাথা হাঁটুতে গুজলো। ছেলেকে নিয়ে এতক্ষণে যে চিন্তা

তার মগজে নাড়া দিচ্ছিল, তা ক্রমশ শত-সহস্র বিস্মৃত ভাবনার গভীরে হাবুডুবু খেতে খেতে কোথায় যেন ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে।

চিনিরদ্দী এখন অন্য জগতে চলে গেছে। সে ভাবছে তার জীবনের ইতিবৃত্ত। জন্মাবধি তিক্ততা ছাড়া মিষ্টতার স্বাদ সে কখনোই পায়নি। ভেবে পাচ্ছে না, কেন বাপ-মা তার নাম চিনিরদ্দী রেখেছিল। অজানা থেকে এই পৃথিবীর আলোর দোরগোড়ায় ঠেলে দিয়ে কী এমন মিষ্টতা পেয়েছিল ওরা, যার প্রায়শ্চিত্ত আজ তাকে তিলে তিলে করতে হচ্ছে। বাপ-মা তো আগেই সরে পড়ে প্রকৃতির দহন থেকে বেঁচেছে, নইলে সে আজ ওদেরকে জিজ্ঞেস করতো এ নামের সার্থকতা কোথায়।

ভর সন্ধে। চৈত্রের অগ্নিবর্ষী উত্তাপ একটু কমে গেছে এখন। পরিবর্তে দক্ষিণের দিঘি থেকে উষ্ণ-শীতলতা নিয়ে মৃদু হাওয়া বয়ে চলেছে। গেঁয়ো জীবনে ভ্যাপসা গরমের বিদায়ে একটু শীতল হাওয়া প্রশান্তি এনেছে। মাঠ থেকে ফিরে প্রতিদিনের মতো কৃষকরা রাস্তার চৌমাথায় ঘাসের উপর কেউ খেজুর-পাতার পাটি, কেউবা গামছা বিছিয়ে গা এলিয়ে দিয়ে সারাদিনের ক্লান্তি তাড়াচ্ছে। পাশের দিঘিতে কেউ কেউ গা ধুচ্ছে।

সহসা সুরেলা কণ্ঠে চিনিরদ্দীর বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এলো। গেঁয়ো জীবনের স্বভাবমতো সবাই সেদিকে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল। ছেলেটা ডাঙায়-তোলা কাতলা মাছের মতো অনেকক্ষণ পর পর খাবি খাচ্ছে। কেউ একজন মুখে একটু পানি দিল। কেউ কেউ কানের কাছে মুখ নিয়ে আল্লাহর নাম দিচ্ছে।

সুজন ঐ পথেই যাচ্ছিল। চেঁচামেচি-শোরগোল শুনে ও বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। ভিড় ঠেলে গিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখলো, নিথর দুটো চোখ আধ-মেলা অবস্থায় যেন ওর দিকেই চেয়ে আছে। দেহটা এখন অনড় শান্ত, প্রকৃতির মতোই শান্ত। ওর মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল সকালে দৈনিক পত্রিকায় দেখা হাসিখুশিভরা সুডৌল-প্রাণবন্ত শিশুটির ছবি এবং বিশেষ ক্রোড়পত্রের হেডলাইনে মোটা অক্ষরে লেখা শব্দ কয়টি 'আজ বিশ্ব শিশুস্বাস্থ্য দিবস'। ও নিজের অভিজ্ঞতায় আরো কয়েকটা নতুন শব্দ যোগ করে নিল আগামীকালের পত্রিকার হেডলাইন থেকে 'গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিশুস্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে'।

অক্টোবর ১৯৮৮